উপন্যাস

অসুখের পরে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. রহস্যময় গোপন শিহরন........................ 2

২. বাঁশের সাঁকো.......................... 41

৩. একটা খোকা হয়েছে..................... 75

৪. লাস্ট ল্যাপ 97

৫. চোখের বিহ্বল দৃষ্টি 109

৬. এক অফুরান মাঠ 132

৭. দুপুরবেলা চুপি চুপি...................... 140

১. রহস্যময় গোপন শিহরন

বাতাসে আজ কিছু মিশে আছে। রহস্যময় গোপন কোনও শিহরন? কোনও আনন্দের খবর? কোনও সুগন্ধ? কোনও মধুর অশ্রুত শব্দের কম্পন? হেমন্তের সকালে ভিতরের বারান্দায় টিয়া পাখি অস্ফুট কিছু কথা বলতে চাইছে। ভোরের আলোটিতে আজ কিছু গাঢ় হলুদের কাঁচা রং।

শিয়রের মস্ত জানালার খড়খড়ির একটি পাটি ভাঙা। পুবের তেরছা রোদ একফালি এসে পড়ে আছে মেঝেয়, যে মেঝে প্রায় একশো বছরের পুরনো। মস্ত উঁচু সিলিঙে খেলা করছে রোদের আভা। বিমের খাঁজে চতুর পায়ে ঘুরছে ফিরছে বন্দনার পোষা পায়রারা।

বন্দনার আজ আর অসুখ নেই। তিন দিন হল জ্বর ছেড়ে গেছে। শরীরটা ঠাণ্ডা, বড় বেশি ঠাণ্ডা হয়ে আছে তার। একটুও জোর নেই গায়ে। তবু এমন ভাল দিনটা কি বয়ে যেতে দেওয়া যায়?

তাদের ঘরগুলো বড্ড বড় বড়। কী বিরাট তার পালঙ্কখানা! কত উঁচু। এই পালঙ্কে তার দাদু শুত, তারও আগে হয়তো শুত দাদুরও দাদু। এই পালঙ্কেরও কত যে বয়স! এতকালের জিনিস, তবু পাথরের মতো নিরেট। বন্দনা উঠে বসল। পালঙ্কের অন্য পাশে মা ছিল শুয়ে। ভোরবেলা উঠে গেছে। এ সময়ে মা ঠাকুরঘরের কাজ সারে। তারপর রান্নাঘরে যায়।

বসে বন্দনা আগে তার এলোমেলো চুল দুর্বল হাত দুটি দিয়ে ধরল মুঠো করে। তার অনেক চুল। চুলের ভারে মাথাটা যেন টলমল করে। যেমন ঘেঁস তেমনি লম্বা। খোঁপা বাঁধলে মস্ত খোঁপা। হয় তার।

একটু কষ্ট করেই এলো খোঁপায় চুলগুলোকে সামাল দিল সে। তারপর নামবার চেষ্টা করল। পালঙ্ক থেকে নামা খুব সহজ নয়, বিশেষ করে দুর্বল শরীরে। পালটা বড্ড উঁচু

বলে নামা-ওঠার। জন্য একটা জলচৌকি থাকে। বন্দনা সেটা দেখতে পেল না। বোধহয় অন্য ধারে রয়েছে। পালটা পার হয়ে ওপাশ দিয়ে নামবে কি না একটু ভাবল বন্দনা। এই পালঙ্ক তার ছেলেবেলার সাথী। রেলিং বেয়ে, ছত্রি বেয়ে কত খেলা করেছে। আজ কি পারবে না একটু লাফ দিয়ে নামতে? দুর্বল হাঁটু কি বইতে পারবে তাকে। গত পনেরো দিন সে বিছানা থেকে খুব কমই। নেমেছে। বিছানায় বেডপ্যান, বিছানায় স্পঞ্জ, বিছানাতেই খাওয়া। বিছানা তাকে খেয়ে ফেলেছিল একেবারে।

আস্তে তার ফর্সা ডান পাখানা মেঝের দিকে বাড়িয়ে দিল বন্দনা। পাখানা শুন্যে দুলছে। মেঝে নাগালের অনেক বাইরে। দুর্বল হাতে খাটের বাজু চেপে ধরে খুব সাবধানে কোমর অবধি ঝুলিয়ে দিল বন্দনা। তারপর ঝুপ করে নামল। টলোমলো দুটি পা তাকে ধরে রাখতে পারছিল না। প্রায়। খাটে ভর দিয়ে সে যখন দাঁড়াল তখন মুখে একটা হাসি ফুটল তার।

বন্দনার পরনে একখানা ভারী কাপড়ের নাইটি। গুটিয়ে গিয়েছিল, ঠিকঠাক করে নিল বন্দনা। মেঝে থেকে পাথুরে শীতলতা শরীর বেয়ে উঠে আসছে। একটু শীত করছে তার। শিয়রের কাছে ভাঁজ করা টমেটো রঙের পশমের চাদর রাখা আছে। বন্দনা সেটা গায়ে জড়িয়ে নিল।

তার চেহারা কি খুব খারাপ হয়ে গেছে? উত্তর দিকে মেঝে থেকে প্রায় সিলিং অবধি বিশাল মেহগনি কাঠের আলমারির গায়ে খুব বিরাট আয়না লাগানো। আয়নার পারা কিছু উঠে গেছে। তার সামনে এসে দাঁড়াল বন্দনা। নিজেকে তার একটুও পছন্দ হল না দেখে।

বিবর্ণ রক্তহীন পাঁশুটে মুখ। বরাবরই সে একটু রোগা। এখন কঙ্কালসার হয়েছে তার শরীর। গলাটা কত সরু হয়ে গেছে আরও। ঝ্যালঝ্যাল করছে গায়ের পোশাক।

বন্দনা তার দুটি হাওয়াই চটি পরে নিল। ধীর পায়ে সে এসে দাঁড়াল ভিতরের বারান্দায়। তাদের পুরনো আমলের বাড়ির সবকিছুই বড় বড়। এই বারান্দায় একসময়ে দুশো লোক

পংক্তিভোজনে বসত। আজকাল পংক্তিভোজন হয় না। বারান্দার সামনের দিকে ওপর থেকে অনেকটা জুড়ে কাঠের আবডাল, তার নীচে রঙিন কাঁচ। বুক সমান লোহার মজবুত রেলিং। বারান্দায় কয়েকটা খাঁচা দুলছে। আগে অনেকগুলো খাঁচা ছিল। আজকাল নেই। মোট চারটে খাঁচার মধ্যে দুটিতে দুটি পাখি আছে। একটায় টিয়া, অন্যটায় একটা বুলবুলি। আর দুটো খাঁচা উত্তরের শিরশিরে হাওয়ায় দুলছে।

খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে টিয়াকে একটু দেখল বন্দনা। খাঁচার মধ্যে পাখি দেখতে তার ভাল লাগে না। বিলু পাখি পোষে। কিন্তু বিলু বড় হচ্ছে, এখন আর পাখির দিকে মন নেই তেমন। বিলু এখন ক্রিকেট খেলতে যায়, ফুটবল খেলতে যায় বিলুর এখন অনেক পড়াশোনার চাপ।

বুকসমান রেলিঙের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বন্দনা নীচের বাঁধানো উঠোনটা দেখল। ভাঙ শান, কোনও কচু গাছের ঝোপ, ঘাস, আগাছ। উঠোনের মাঝখানে বাঁধা তারে কয়েকটা কাপড় শুকোচ্ছে। উঠোনের ওপাশে কাছারি-ঘর। অবশ্য এখন আর নায়েব গোমস্তা কেউ নেই। ওখানে এখন মদনকাকা থাকে। কাছারি-ঘর ছাড়িয়ে একটা বাগানের মতো আছে। তারপর ভাঙা দেউড়ি।

এ বাড়ির মধ্যে এখনও একশো বছরের পুরনো বাতাস। এখনও তাদের হয়-ছয়া গুলোতে গুনগুন করে বেড়ায় কত ইতিহাস। দেয়ালে দেয়ালে এখনও সোনালি ধাতব ফ্রেমে বাঁধানো অয়েল পেন্টিং। তাদের পূর্বপুরুষেরা ছবির চোখ মেলে চিত্রার্পিত চেয়ে থাকে।

ঘুরে দাঁড়ালেই দেখা যাবে দেয়ালে আঠা দিয়ে সাঁটা লেনিনের একখানা ছবি। ধুলোটে ময়লা পড়েছে ছবিতে, বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু মা কখনও ওই ছবি খুলতে দেয়নি কাউকে। ছবিটা লাগিয়েছিল বন্দনার দাদা প্রদীপ। দাদা আর নেই।

আজ হেমন্তের এই সকালে বন্দনা টের পাচ্ছে, তার চারদিককার আবহে একটা চোরা আনন্দের স্রোত। কেন? সে কি অসুখ থেকে উঠেছে বলে?

বন্দনা লেনিনের ছবিটার দিকে চেয়ে রইল। ওই ছবিটার দিকে তাকালে তার দাদার কথা মনে পড়ে। একটু কষ্ট হয়।

ঘর থেকে মা ডাকল, বন্দনা, কোথায় গেলি দুর্বল শরীরে?

এই তো মা আমি! বারান্দায়।

তার ফর্সা গোলগাল মা বেরিয়ে এল বারান্দায়, ওমা, তুই উঠে এসেছিস?

আজকের দিনটা কী ভাল, না মা?

আয় ফলের রস এনেছি।

এখানে এনে দাও।

ফলের রস বন্দনার ভাল লাগে না। তার কিছুই খেতে ভাল লাগে না। মায়ের ভয়ে খায়। তার মা দুঃখী মানুষ।

কিন্তু আজ দুঃখের দিন নয়। কী সুন্দর একটা দিন যে বন্দনাকে উপহার দিয়েছে এই পৃথিবী। আজ যেন স্বপ্নের আলো, স্বপ্নের বাতাস। আজ যেন কিছুই সত্যি নয়, সব রূপকথা।

সাদা পাথরের ভারী গেলাসে চুমুক দিয়ে সে ফলের রসেও একটা আলাদা স্বাদ পেয়ে গেল। ছোট্ট ছোট্ট তিনটে চুমুকের পর সে মুখ তুলে বলল, আজ আমগাছ তলায় একটু বসব মা?

মা তার দিকে চেয়ে বলে, আজ থাক না। দোতলা একতলা করতে কষ্ট হবে।

না মা, কষ্ট হবে না। কতদিন ঘরে পড়ে আছি বলো তো!

তা হলে দাঁড়া, বাহাদুরকে বলি ইজিচেয়ারটা পেতে দিতে।

একটু সাজবে কি বন্দনা? আজ যেন কয়েদখানা থেকে মুক্তি। অসুখের চেয়ে খারাপ কয়েদখানা আর কী আছে?

আয়নার সামনে নিজের পাঁশুটে চেহারাটার মুখোমুখি ফের দাঁড়ায় সে। খড়িওঠা মুখে একটু ক্রিম ঘসতেই মুখের রুগণতার রেখাগুলি ফুটে উঠল ভীষণ। কেন যে সে এত রোগা! এই শরীরে অসুখ হলে শরীর যেন হাওয়ায় নুয়ে পড়তে চায়।

এ শরীরে রং-চং মানাবে না বলে খুব হালকা গোলাপি রঙের একটা তাঁতের শাড়ি পরে নিল সে। চুল আঁচড়াল। তারপর পশমের টমেটো রঙা শালটা জড়িয়ে ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড হলঘর পেরিয়ে দরদালানে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল সে। পাথরে বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি, লোহার কারুকাজ করা রেলিং। আজ মনে হচ্ছে, কতদূর নেমে গেছে সিঁড়ি, সে কি পারবে এত সিঁড়ি ভাঙতে? মাঝ-সিঁড়ির চাতালে মস্ত শার্সি দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে। বাইরের আলোয় যেন নেমন্তন্নের চিঠি। এসো, এসো, আজ তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। আজ তোমার দিন।

পিছনের বাগানে কিছু পরিচর্যা আছে। বুড়ো মালি গোপাল এখন থুথুড়ে হয়ে গেছে। তার বাঁকা কোমর সোজা হতে চায় না, হাত কাঁপে, কানে শুনতে পায় না, চোখেও ছানি। তবু সে পিছনে একটুখানি জায়গায় মায়ের পুজোর জন্য ফুল ফোঁটায়। বাকি অনেকটা জমি ফাঁকা পড়ে আছে, আগাছা আর ঘাসের জঙ্গল।ঘের-দেয়াল দৃ জায়গায় ভেঙে গেছে বলে আজকাল গোরু মোষ ঢোকে, চলে আসে পথবাসী কুকুর। গোপালের বাগানের জন্য ছোট্ট একটু চৌখুপি জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে মা। এর বেশি গোপাল আর পারে না।

সেই চৌখুপি জায়গার মুখোমুখি পুরনো আমগাছের ছায়ায় ইজিচেয়ার পাতা হয়েছে।

উৎসবের বাড়িতে গেলে যেমন সবাই আসুন বসুন করে আজ বন্দনা বাইরে পা দেওয়ামাত্র যেন নিঃশব্দে চারদিকে একটা অভ্যর্থনা হতে লাগল তার। খোলা বাতাস তার

কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল। বোদ জাপটে ধরল তাকে আদরে। কতদিন পর তার এই একটুখানি বাইরে আসা।

এ তার আজন্ম চেনা বাগান, চেনা গাছ। এই বাড়ির মতো এত প্রিয় জায়গা এ পৃথিবীতে কোথাও নেই তার। এ বাড়ি ছেড়ে সে কোনওদিন কোথাও যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কত মায়ায় যে মেখে আছে বাড়িটা। মেঘলা দিন বা গ্রীষ্মের দুপুরে, শীতের সন্ধে বা নিশুত রাতে এ বাড়িটা নানারকম রূপ ধরে।

বাড়িটা অবশ্য এখন আর সুন্দর নেই। ছাদের গম্বুজগুলো ভেঙে পড়ে গেছে, নোনা আর শ্যাওলা ধরেছে দেয়ালে, অশ্বত্থের চারা উঁকি দিচ্ছে এখানে সেখানে। কতকাল মেরামত হয়নি, কলি ফেরানোনা হয়নি। তবু আজও এই গম্ভীর বাড়ি চারদিকটাকে যেন শাসনে রাখে। লোকে এখনও ভক্তি শ্রদ্ধা করে এসব বাড়িকে। মলি বলে, তোদের বাড়িটা ফিউডাল হলেও বেশ কমফোর্টেবল। স্পেস একটা মস্ত বড় ফ্যাক্টর। আমাদের বাড়িতে স্পেস নেই বলেই যত গণ্ডগোল। যত ঘেঁষাঘেষি হবে, মানুষে মানুষে, তত বেশি ক্ল্যাশ হবে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারবে না। স্পেস একটা মস্ত বড় সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর। সেদিক দিয়ে তোদের বাড়িটা দারুণ ভাল। বিগ হাউস, বিগ স্পেস, আইসোলেশন। গুড। ভেরি গুড। আমি ছেলেবেলা থেকে একটা আলাদা ঘরে একা থাকার স্বপ্ন দেখি। কী রকম ক্রাউডেড বাড়িতে আমরা থাকি বল তো। ওরকমভাবে থাকলে মানুষের ইমাজিনেশন মরে যায়, গুড কোয়ালিটিজ নষ্ট হয়ে যায়, সবচেয়ে বেশি হয় মেন্টাল ডিস্ট্যাবিলাইজেশন।

বন্দনা কথাটা কি স্বীকার করে? সে কখনও মলির মতো ক্রাউডেড বাড়িতে থাকেনি। তাদের বাড়িতে মানুষ খুব কম। তবু এ বাড়িতে কি অশান্তির অভাব? এই চুপচাপ বাড়ির ভিতরেও নিঃশব্দে ছিঁড়ে যায় কত বাঁধন, নিশুত রাতে কত চোখের জলে ভিজে যায় বালিশ, বুকের ভিতর কত তুষের আগুন জেগে থাকে ধিকিধিকি। এই গম্ভীর শান্ত বাড়ির বাইরে থেকে কি তা বোঝা যায়?

আজ দুঃখের দিন নয়। আজ এই রোদে হাওয়ায় বসে থাকতে বন্দনার কী ভালই না লাগছে, উড়ে যাচ্ছে দিন। নীল আকাশে সাদা হাঁসের মতো ভেসে যাচ্ছে হালকা পাখায়। আনন্দে দম নিতে মাঝে মাঝে কষ্ট হচ্ছে তার। বুকের ভিতরটা ডগমগ করছে। এমন দিনে কি দুঃখের কথা ভাবতে হয়।

বাহাদুর দুধের গেলাস নিয়ে এল।

টক করে খেয়ে নাও তো খুকুমণি।

কাঁচের গেলাসে সাদা দুধ, ওপরে আর নীচে দুটো চিনেমাটির প্লেট-দৃশ্যটা দেখলেই বন্দনায় জিব থেকে পেট অবধি বিস্বাদে ভরে যায়। দুধের চেয়ে খারাপ জিনিস পৃথিবীতে আর কী আছে? তবু রোজ খেতে হয়।

বাহাদুর তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসে, নাক টিপে খেয়ে নাও। হারা দিব।

আগে দাও। বলে হাতখানা পাতে বন্দনা।

মা ওপর থেকে দেখছে কিন্তু। বলে বাহাদুর বা হাতে গেলাসটা ধরে ডান হাতে গায়ের খাটো হাতাহীন মোটা কাপড়ের সবুজ জামার ঝুল-পকেট থেকে কয়েকটা ভাজা কচি হাক বের করে তার হাতে দিল।

খেজুরের বিচির মতো সরু আর ছোট এই হকি বালিতে ভেজে কৌটোয় ভরে, দেশ থেকে নিয়ে আসে বাহাদুর। খেতে যে খুব ভাল লাগে বন্দনার তা নয়। কিন্তু বিস্বাদ কিছু খাওয়ার পর হার চিবোলে মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়। মুচমুচে কষ কষ জিনিসটার ওই একটা উপকার আছে।

কোনও কিছুই সে তাড়াতাড়ি খেতে পারে না। আস্তে খায়, অনিচ্ছর সঙ্গে খায়। বাহাদুর সামনে উবু হয়ে বসে বলল, আজও জোর মারপিট লাগবে।

কার সঙ্গে?

বাবুর সঙ্গে ল্যাংড়ার। দোকান পসার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সকালে বাজারে গিয়ে শুনে এলাম।

আজ মারপিট হবে? কেন মারপিট হবে আজ? এমন সুন্দর একটা দিনে কোনও খারাপ ঘটনা কি ঘটতে পারে? রোদে হাওয়ায় এই যে উজ্জ্বল একটা ভাল দিন এল আজ, এ কি বৃথা হয়ে যাবে?

তাদের বাড়ির পিছনের দিকে দেয়ালের ওপাশে ভীষণ নোংরা একটা গরিব পাড়া আছে। শোনা যায় তারা একসময়ে এ বাড়ির প্রজা ছিল। ঘিঞ্জি অলিগলি আর খাপরা বা টালির ঘর, দু-চারটে পাকা বাড়ি, কাঁচা নর্দমা, মাইকের আওয়াজ আর ঝগড়া-এই সব নিয়ে ওই পাড়া। ওখানেই ল্যাংড়া নামে খোঁড়া একটা ছেলে থাকে। ভীষণ গুণ্ডা। আর বাবু হল সুবিমল স্যারের দলের ছেলে। সেও গুণ্ডা, তবে লেখাপড়া জানে। সে দক্ষিণের পাড়ায় থাকে। তার বাবা পঞ্চানন সেন উঁদে উকিল। বন্দনার বোকা দাদা প্রদীপ সুবিমল স্যার আর বাবুর পাল্লায় পড়েই পলিটিক্স করতে গিয়েছিল।

ভাজা হত্তুকি খাওয়ার পর জল খেলে জিবটা মিষ্টি মিষ্টি লাগে। কিন্তু বাহাদুরকে এখন জলের কথা বলার মানেই হয় না। বাহাদুর একটু তফাতে বাসের ওপর আঁট করে বসেছে।

ল্যাংড়া শালা গত সপ্তাহে দুটো পাম্প মেশিন চুরি করে এনেছে। ভোলা তুলছে। কোমরে আজকাল রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

করুণ গলায় বন্দনা বলল, আজ ওসব কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না বাহাদুর। আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

মাকে বলেছি, পিছনের দেওয়ালটা সারিয়ে নিতে। ল্যাংড়া খচ্চর একদিন ঢুকে ওইখানে জামগাছের তলায় দলবল নিয়ে মদ খাচ্ছিল। তোমার তখন জ্বর।

ও মাগো! কী সাহস!

ও শালার খুব বুকের পাটা।

মদ খাচ্ছিল? তোমরা কিছু বললে না?

কে কী বলবে? আমি গিয়ে বললাম, এখানে ঢুকেছিস কেন? বলল, তাতে তোর বাবার কী রে শালা? ফোট। আমি বললাম, হীরেনবাবুকে বলে দিলে তুলে নিয়ে যাবে। তাতে তেড়ে এল। তবে আর বেশিক্ষণ বসেনি।

হীরেনকাকুকে বলেছ নাকি?

আরে না। পুলিশওলাদের তো জানো। এরও খায়, ওরও খায়। হীরেনবাবু যদি তুলে নিয়ে যায় ল্যাংড়া একদিন বেরিয়ে আসবেই। তার আগে ওর দলবল হামলা চালাবে। আমাদের কে আছে বলো! ঝুটঝামেলা না করে দেয়ালটা গেঁথে দিলেই হয়। কত টাকারই বা মামলা?

দুধটার বিস্বাদ আর টের পাচ্ছিল না বন্দনা। তার সুন্দর দিনটা শেষ অবধি হাই হয়ে যাবে? তাদের এই স্বপ্নের বাড়ির মধ্যে কি ঢুকে পড়বে ওই বিচ্ছিরি বাইরেটা? এ বাড়ির মধ্যে তাদের একটা শান্ত, স্নিগ্ধ জগৎ। হয়তো অনেক চোরা-অন্ধকার আছে, তবু বাইরে থেকে এসে বাড়িতে ঢুকলেই একশো-দেড়শো বছরের পুরনো গন্ধ, পুরনো বাতাস, পুরনো আবহের রূপকথা যেন বুকে তুলে নেয়।

বাহাদুর একটু উদাস হয়ে সামনের দিকে চেয়েছিল। পঞ্চাশের ওপরে বয়স। বাড়ি উত্তরপ্রদেশের এক পাহাড়ি গ্রামে। বন্দনার জন্মের আগে থেকেই সে এ বাড়িতে আছে। মাঝে মাঝে দেশে যায়। তার খুব ইচ্ছেগোরু আর মোষ কিনে দুধের ব্যবসা করে। কিন্তু তত টাকা আজও জমাতে পারেনি। তার দেশে বড় টানাটানি।

দুধটা শেষ করে গেলাসটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল বন্দনা।

তোমার দেশের গল্প করো না বাহাদুর।

এখন নয়। কাজ আছে। রাতে হবে।

গল্প কিছুই নয়। একটা পাহাড়ি গ্রাম, পাশে একটা ঝরনা বয়ে গেছে। সেখানে ছাগল চরে বেড়ায়, মকাই ধান গম হয়। গরিব লোকেরা কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকে। এই হল গল্প। তবু বন্দনা যেন গ্রামটা স্পষ্ট দেখতে পায়। পাথর গেঁথে তোলা ঘর, ওপরে টিন বা টালির ছাউনি। নিরিবিলি, নিশ্চপ, তার মধ্যেই হয়তো একটা মোরগ ডেকে ওঠে। পাখিরা কলরব করে উড়ে যায়। ঝরনায় জল খেতে আসে ভীরু পায়ে হরিণেরা। গম পেষাইয়ের শব্দ ওঠে জাঁতায়। ফুল ফোটে। হাওয়া বয়। সন্ধের পর শীতের রাতে আগুন ঘিরে বসে গল্প করে গাঁয়ের লোকেরা। সেই গাঁয়ে কোনও বাইরের লোক যায় না। শুধু তারা থাকে তাদের নিয়েই। এই গাঁয়ের তেমন কোনও লোমহর্ষক গল্পও নেই। বাহাদুর শুধু মন্থর গলায় দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে যায়। বন্দনার কী যে ভাল লাগে!

বন্দনার খুব ইচ্ছে করে একটা পাহাড়ি গাঁয়ে গিয়ে থাকে। বন্দনা তেমন কোথাও যায়নি কখনও। পাহাড়ে খুব কম। একবার দার্জিলিং গিয়েছিল। তখন থেকে পাহাড়ের কথা তার খুব মনে হয়।

বাবা একটু ঘরকুনো মানুষ ছিল বলে তাদের কোথাও তেমন বেড়াতে যাওয়া হয়নি। শুধু ঘরকুনো নয়, ভীষণ ভিতুও। বাবা মেঘনাদ চৌধুরির নামটা যেমন বীরত্বব্যঞ্জক, স্বভাবটা ঠিক তার উল্টো। তবে বাবা একজন কবির মতো মানুষ। দুখানি মায়াবী চোখ দিয়ে অবিরল বিশ্রী পৃথিবীর ওপর নানা কল্পনার ছবি এঁকে যেত। বন্দনা ছিল বাবার প্রাণ। পৃথিবীতে এত ভালবাসা কি আর হয়? বন্দনা বাবাকে কত ভালবাসত?

বাবা জিজ্ঞেস করলে বন্দনা বলত, আকাশের মতো।

বাবার সঙ্গে খাওয়া, বাবার বুক ঘেঁসে শোওয়া, বাবার সঙ্গে সর্বক্ষণ। গায়ের গন্ধটা অবধি কী মিষ্টিই না লাগত! কত কী ভুলে যেত বাবা! গায়ে উল্টো গেঞ্জি, দু পায়ে দুরকম চটি,

নুন আনতে বললে চিনি আনা। বাবার ভুলের গল্পের শেষ নেই। একজন কবির মতো মানুষ। অন্যমনস্ক, মাথায় চিন্তা এবং দুশ্চিন্তার বাসা, মুখে সবসময়ে একটা অপ্রস্তুত হাসি। বাবার ফুলের বাগানের শখ ছিল, আর গানের। কোনওটাই বাবা নিজে পারত না। কিন্তু বাবার সময়ে পিছনের বিস্তৃত বাগানে। হাজারো রকমের ফুলের চাষ হত, আর মাঝে মাঝে গায়ক গায়িকাকে ডেকে এনে ছোট্ট গানের আসর বসাত। বেশির ভাগই রবীন্দ্রসঙ্গীত।

বাবার কোলের কাছটিতে বসে মুগ্ধ হয়ে গান শুনতে শুনতেই একদিন তার ভিতরকার ঘুমন্ত সুর গুনগুন করে জেগে উঠেছিল।

আগের দিন সন্ধেবেলা বাবুপাড়ার মণিকাদি গান গেয়ে গেছেন, একটা গান কিছুতেই ছাড়ছিল না বন্দনাকে। রাতে ঘুমের মধ্যেও গানটা হয়েছিল তার বুকের মধ্যে। গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা সবচেয়ে ভাল লাগত, চেয়েছিনু যবে মুখে তোলো নাই আঁখি, আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি....

পরদিন সকালে ইস্কুলে যাওয়ার আগে স্নান করবে বলে মাথায় তেল ঘসতে ঘসতে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গাইছিল বন্দনা।

বাবা পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, মাগো, তোমার গলায় যে সরস্বতী ভর করে আছেন!

সেদিনই মণিকাদির কাছে নিয়ে গেল বাবা, মণিকা, তুমি ওকে শেখাও। মাত্র আট বছর বয়স, পারবে।

বন্দনা পেরেছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে স্কুলের ফাংশনের বাঁধা গায়িকা। নানা ছোটখাটো অনুষ্ঠানে ডাক আসতে লাগল। বাবা নিয়ে যেতে লাগল নানা জায়গায়। রেডিয়োর শিশুমহলে গেয়ে এল একবার।

সেই থেকে গানে গানে ভরে উঠতে লাগল জীবন। গানের হ্যাপাও ছিল কম নয়। তেরো বছর বয়সেই বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল মধুবাবুর বাড়ি থেকে। ছেলে ডাক্তারি পড়ে। প্রেমপত্র আসতে লাগল অনেক। রাস্তায়-ঘাটে ছেলেদের চোখ তাকে গিলে খেতে লাগল। সে এমন কিছু সুন্দরী। নয়, তবুও। সে এদের কারও প্রেমে পড়েনি কখনও। কিন্তু কেন যে একজনের কথা ভাবলেই আজও তার ভিতরটা আলো হয়ে যায়। অথচ সে তো গরিব এক পুরুতের ছেলে। তার বেশি কিছু নয়। শিশুকালে সে একবার পুতুলের বিয়ের নেমন্তন্নে ডেকে অতীশকে বলেছিল, তোমার সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হবে, না অতীশদা?

অতীশ জিভ কেটে বলেছিল, তাই হয় খুকি? তোমরা আমাদের অন্নদাতা। মনিব। প্রে

মপত্র পেলেই ছুট্টে এসে চিঠিটা বাবাকে দিত বন্দনা, দেখ বাবা কী সব লিখেছে!

দু-একটা চিঠিতে অসভ্য কথা থাকত বটে, কিন্তু বেশির ভাগই ছিল আবেগের কথায় ভরা। আবেগের চোটে বানানের ঠিক থাকত না, বাক্যেও নানা গণ্ডগোল থেকে যেত। বাবা আবার সেগুলো লাল কালিতে কারেকশন করে নিজের কাছে রেখে দিত।

সবচেয়ে ভাল চিঠিটা লিখেছিল বিকু। তাতে ইংরিজিতে একটা কথা লেখা ছিল, লাভার্স অ্যাট ফার্স্ট সাইট, ইন লাভ ফরএভার। পরে বন্দনা জানতে পেরেছে ওটা ফ্রাঙ্ক সিনাট্রার একটা বিখ্যাত গানের লাইন।

এইসব চিঠিপত্র নিয়ে বাবার সঙ্গে তার আলোচনা এবং হাসাহাসি হত। বাবা বলত আমার তিনটে স্টাম্প। তিনটেকেই গার্ড দিয়ে খেলতে হয়। তুই হচ্ছিস আমার মিডল স্টাম্প। সবচেয়ে ইম্পট্যান্ট।

মিডল স্টাম্পই বটে। দাদা আর ভাইয়ের মাঝখানে সে। তার ওপর সে আবার মেয়ে। বাবার চোখের মণি। বুকের ধন।

সন্ধেবেলা ঘুমিয়ে পড়া ছিল তার দোষ। ছিল কেন, আজও আছে। কেউ তুলতে পারত না খাওয়ার সময়ে। বাবা এসে তুলত, বুকের ধন, বুকের ধন, ওঠো।

ঘুমচোখে তুলে বাবা নিজের হাতে গরাস মেখে খাইয়ে দিত। বাবার হাতে ছিল মায়া। সেই হাতের গরাসটা অবধি স্বাদে ভরে থাকত।

কোম্পানির কাগজ, শেয়ার আর ডিভিডেন্ড এসব কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে বন্দনা। আসলে এই তিনটে শব্দ থেকেই তাদের ভাতকাপড়ের জোগাড় হত। মেঘনাদ চৌধুরীর কোম্পানির কাগজ ছিল। অর্থাৎ শেয়ার। আর ফাটকা খেলার নেশাও ছিল। চাকরি করেনি কখনও। আজও তাদের চলে ওই কোম্পানির কাগজে। অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে আরও। আরও।

বিজু একবার বলেছিল, তোদের বাড়ির দেওয়ালগুলো অত মোটা মোটা কেন বল তো? শুনেছি রাজা জমিদারা আগের দিনে শত্রুদের মেরে দেওয়ালে গেঁথে ফেলত। তাই নাকি?

বন্দনা খুব হেসেছিল।

ফচকে মেয়ে বিজু বলল, যদি তা না হয় তবে নিশ্চয়ই দেওয়ালের ভিতরে গুপ্তধন আছে।

আহ! তা যদি হত। দেওয়াল ভাবেই যদি ঝরঝর করে ঝরে পড়ত মোহর!

মায়ের কাছে আজকাল কিছু চায় না বশনা। চাইলেই মায়ের মুখখানা শুকিয়ে যায়। বন্দনা চায় না, কিন্তু বিলু চায়। ফুটবল খেলার বুট, সাইকেল, এয়ারগান, দামি কলম, প্যান্ট বা শার্ট। বিলু তো মায়ের মুখ লক করে না। তার তত সময় নেই। সে হুট করে আসে, হুট করে বেরিয়ে যায়। এখন বাইরের জগৎ তাকে অনেক বেশি টানে।

দাদাকেও টেনেছিল। প্রদীপ একটু বোকা ছিল। আর খুব গোঁয়ার। পঞ্চানন সেনের ছেলে বাবু ছিল ওর খুব কাছের লোক। পঞ্চানন সেরে মেলা টাকা আর মেলা ছেলেপুলে। বাবু বোধহয় আর সাত নম্বর সন্তান। বেশ ভদ্র চেহারা, কথাবার্তায় প্রবল আত্মবিশ্বাস, কিন্তু

অহঙ্কার নেই। বাবু মানুষের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করে না। কিন্তু প্রয়োজন হলে রুদ্রমূর্তি ধরে তাণ্ডব লাগিয়ে দিতে পারে। বাবু ছিল প্রদীপের হিরো। ছেলেবেলা থেকে সে বাবুর সাগরেদি করে এসেছে।

বাবুর হিরো হলেন সুবিমল স্যার। তাঁর কথায় গোটা এলাকা ওঠে বসে। সুবিমল স্যার একেবারে সাধুসন্নিসির মতো মানুষ। তাঁর ধ্যানজ্ঞান হল পার্টি। বিয়ে করেননি, পৈতৃক বাড়ির বাইরের দিককার একখানা ঘোট ঘরে ছোট্ট একটা তক্তপোশে দিনরাত বসে থাকেন। সামনে বিড়ির বান্ডিল, দেশলাই আর ছাই বা বিড়ির টুকরো ফেলার জন্য মাটির ভাঁড়। গাদা গাদা কাগজপত্র চারদিকে ছড়ানো। ঘরে সর্বদাই পার্টির ছেলে ছোকরাদের ভিড়। ঘড়ি ঘড়ি চা আসে সেখানে। দু বেলা দু মুঠো খাওয়া ছাড়া ভিতর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। অথচ ভিতর বাড়িতে ভরভরন্ত সংসার। দুই ভাই, ভাইয়ের বউ এবং ছেলেমেয়েরা, সুবিমল স্যারের মা এখনও বেঁচে! সুবিমল স্যারও হিরো, তবে অন্য ধরনের। তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা, সরল জীবন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি–এরও কি ভক্ত নেই? সুবিমল স্যারের অনেক ভক্ত। তিনি কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর। ক্লাস খুব কমই নেন। সবাই সমীহ করে চলে।

প্রদীপ বাবুর সঙ্গে সেখানে গিয়ে জুটল। যারা নেতা হতে পারে না তারা নেতাদের খিদমদগার হয়। প্রদীপ ছিল তাই। বোকা ছিল বলে তার পড়াশুনোয় উন্নতি হয়নি। রাজনীতিতেও নয়। সে পার্টির আদর্শ ভাল করে বুঝতও না। সে শুধু ছিল বাবু আর সুবিমল স্যারের অন্ধ ভক্ত। ও বাড়িতেই পড়ে থাকত বেশির ভাগ সময়। চা এনে দিত, পোস্টার লিখত, ইস্তাহার বিলি করত আর বিপ্লব-বিপ্লব.করে মাথা গরম করত। ইলেকশন ক্যাম্পেনের সময় প্রদীপ রাত জেগে দেওয়ালে লিখছিল। নিদোষ কাজ। মাঝরাতে বিপক্ষের ছেলেরা এসে দেওয়ালের দখল নিয়ে ঝগড়া বাধায়। তারপর হাতাহাতি মারপিট। তার জের চলল দু-তিন দিন ধরে। দ্বিতীয় দিন রাতে সুবিমল স্যারের বাড়ি থেকে গভীর রাতে ফেরার সময় রথতলার মোড়ে তাদের বিপক্ষের দল ঘিরে ফেলল।

গোলমালে অন্যগুলো পালাল, বোকা প্রদীপ পারল না। বুকে ছোরা খেয়ে মরে গেল। না, একজন পালায়নি। সে হল অতীশ। প্রদীপকে বাঁচাতে পারেনি বটে, কিন্তু ছিল।

মৃত্যু যে এত সহজ তা জানাই ছিল না বন্দনার। এই জানল। পরদিন ওই জায়গাটায় শহিদ বেদি তৈরি হল। লেখা হল কমরেড প্রদীপ চৌধুরি অমর রহে। পার্টির ছেলেরা এসে বাবাকে কত সান্ত্বনা দিল।

বাবার অফস্টাম্প উপড়ে গেল সেদিন। কবির মতো মানুষটির টানা টানা মায়াবী দুখানি চোখে পৃথিবীর সব স্বপ্নের রং মুছে গেল। এ যে কঠোর বাস্তব! এ যে রক্তে রাঙা ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নিজের সন্তান। দিশেহারা বাবা কেবল যেটাছুটি করতে লাগল। ঘরে, বারান্দায়, রাস্তায়, এর ওর তার বাড়ি। এবার বন্দুক নিয়েও বেরিয়ে পড়েছিল। মা কয়েকদিনের জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বন্দনা আর বিলু এত ভয় আর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল যে, তারা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল।

শহিদ বেদিটা আর নেই। ইট আর সিমেন্টের কাঁচা বেদি কবেই লোপাট হয়ে গেছে। প্রদীপ নেই, মানুষের মনে তার স্মৃতিও নেই। শুধু এ বাড়িতে কয়েকজন মানুষের কাছে প্রদীপ আজও বেঁচে আছে স্মৃতি হয়ে।

মাকে প্রথম দুখটা দিয়ে গেল দাদা। এ বাড়িতে বন্দনার জন্মের পর প্রথম শোক। তার আশ্চর্য অভিঘাত এবং প্রতিক্রিয়া যেন ঝনঝন করে বাজত তাদের অস্তিত্বে।

প্রদীপের মৃত্যুর পর হীরেনবাবুর যাতায়াত শুরু হয়। এনকোয়ারি। এনকোয়ারির পর এনকোয়ারি। বুলু নামে একটা ছেলে প্রদীপকে মেরেছিল। সে ফেরার হয়ে যায়। মাঝখানে শুধু জেরার জবাব দিতে দিতে হাঁপিয়ে গেল তারা। বুলু ধরা পড়ল না। লোকে বলত, পুলিশ ওকে ধরবেই না। সাঁট আছে।

বুলু ছেলেটা যে কে তা আজও জানে না বন্দনা। শুনেছে, সে একটা বস্তিবাসী ছেলে। মস্তান। তার বাপের একটা তেলেভাজার দোকান আছে বাজারে। আসলে সেখানে দেশি মদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য চাট তৈরি হয়। শুকুবাহাদুর মদ খায় বলে দোকান চেনে।

হীরেনবাবু বাপটাকে অ্যারেস্ট করেছিল। পরে ছেড়ে দেয়। তার তো কোনও দোষ ছিল না।

মাকে দ্বিতীয় দুখটা দিল বাবা। প্রদীপের মৃত্যুর দুবছর বাদে যখন শোকটা তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে যখন বাবার চোখে মায়াবী দৃষ্টিটা ফের ফিরে এসেছে এবং মা যখন সংসারের কাজে মন দিয়েছে ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। পৃথিবীতে কতই না আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।

রমা মাসি তার মায়ের আপন পিসতুতো বোন। অন্তত পনেরো ষোলো বছরের ছোট। দেখতে ভারী মিষ্টি। ডান চোখের নীচে একটা জরুল থাকায় মুখখানা যেন আরও সুন্দর দেখাত। রংটা চাপা ছিল বটে, কিন্তু রমাকে কেন যেন ওই রংই মানাত।

বিশু কবিরাজ হাঁপানির ওষুধ দেয়। খুব নাম। রমা মাসির হাঁপানি সারাতে মধ্যপ্রদেশ থেকে তার মা তাকে পাঠিয়েছিল এখানে। সেই সূত্রে রমা এ বাড়িতে দু মাস ছিল।

কবে কী হয়েছিল কে বলবে? এই প্রকাণ্ড বাড়ির আনাচে কানাচে কবে যে বাবার সঙ্গে রমা মাসির হৃদয় বিনিময় হল! বন্দনা অন্তত জানে না।

দুজনে অবশ্য ঠাট্টা-ইয়ার্কি হত খুব। খাওয়ার টেবিলে, বাগানে। মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়া হত সবাই একসঙ্গে। যেমন সব হয়।

একদিন গভীর রাতে ঘুমচোখে বন্দনা শুনেছিল মা আর বাবাতে কথা হচ্ছে।

মা বলল, কথাটার জবাব দেবে? না কি?

একথার কি জবাব হয়?

তার মানে মনে পাপ আছে।

পাপের কথা বলছ কেন? তোমার মনেই পাপ আছে।

আমি কি ভুল দেখেছি?

ভুল ছাড়া কী? তোমাকে সন্দেহ বাইতে ধরেছে।

সন্দেহ?

সন্দেহ ছাড়া কী?

আমার চোখে তো ছানি পড়েনি! তুমি অন্ধকারে বারান্দায় ওর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিলে। খুব ঘেঁসে। তখন আমার নীচের তলায় রান্নাঘরে থাকার কথা। বন্দনা মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছিল। বিল ফেরেনি। ঠিক বলছি?

একবার তো বললে! শুনেছি।

তুমি তো ভাবনি যে, আমি এসে পড়ব!

এলে তো কী হল? আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, হাওয়া খাচ্ছিলাম। ও এসে পাশে দাঁড়াল। গল্প করছিলাম।

তা বলে অত ঘেঁসে?

তাতে কী? অন্ধকারে যত ঘেঁসে মনে হয়েছে ততটা নয়। তফাত ছিল। তুমি কি আমাকে চরিত্রহীন মনে করো?

আগে তো কখনও করিনি।

মেয়েদের ওইটেই দোষ। স্বামীদের অকারণে সন্দেহ করে। বাবা একটু হাসবার চেষ্টা করেছিল এসময়ে। হাসিটা ফোটেনি।

মা একটু চুপ করে থেকে বলল, ওকে আমি চিনি, ঢলানি মেয়ে। পুরুষ-চাটা। তা বলে তুমি তো আর সস্তা নও। হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। তুমি কালই ওর ফেরত যাওয়ার টিকিট কিনে এনো। ওকে আর এখানে রাখব না।

তাই হবে।

সারা রাত বারবার ঘুম চটে গেল বন্দনার। বুকের মধ্যে একটা ভয়-ভয়, একটা ব্যথা, একটা অস্বস্তি। বাবা আর মায়ের মধ্যে ঝগড়াঝাটি খুব কম হয়। মা শান্ত ও সংসারমুখী মানুষ, বাবা উদাসীন ও অন্যমনস্ক। মা যদিও বা কখনও কখনও ঝগড়া করে বাবা একদমই নয়। ফলে ঝগড়া হয়, একতরফা হয়ে যায়।

সেই রাতে মা বাবার ওইসব কথাবার্তার পর কেউই এসে আর প্রকাণ্ড পালঙ্কের বিছানায় শুল না! মা আর বাবার মাঝখানে শোয় বন্দন-বাবার দিকে একটু বেশি ঘেঁসে। সেই রাতে বাকি রাতটুকু এই শুয়ে থাকল সে। একা লাগছিল, ফাঁকা লাগছিল, কান্না পাচ্ছিল। রমা মাসিকে মনে হচ্ছিল, রাক্ষুসি। কেন এল এবাড়িতে? না এলেই তো ভাল ছিল!

অথচ আশ্চর্য এই, সেই রাতের আগে অবধি রমা মাসির মতো এমন চমৎকার বন্ধু আর পায়নি বন্দনা। গয়ে, গানে, খুনসুটি আর হাসিতে তাদের দুজনের চমৎকার সময় কাটত। সকালে উঠেই সে গিয়ে পুবের ঘরে রমা মাসির বিছানায় ঢুকে যেত। ভোরবেলা শুয়ে শুয়েই কত গল্প হত। খুলের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা দুজনে সব সময় লেগে লেগে থাকত।

রমা মাসির বুকের ভিতরে একটা সাঁই সাঁই শব্দ হত প্রায় সবসময়। কখনও মৃদু, কখনও জোরালো। শ্রীকালেও গলায় কটার। ঠাণ্ডা জল ছুঁতেই পারত না। পায়ে বারো মাস মোজা। মুখখানায় একটা করুণ ভাব থাকত সবসময়ে।

বিশু কবিরাজ চিকিৎসা শুরু করার পর রমা মাসির হাঁপের রোগ অনেকটা কমে গিয়েছিল। চেহারার উন্নতি হয়েছিল অনেক। রমা মাসির গানের গলাখানা ছিল চমৎকার। কিন্তু হাঁপানির জন্য গাইতে পারত না। টান কমে যাওয়ার পর এক একদিন গাইত। কী সুরেলা গলা

মা আর বাবাতে যে রাতে ওইসব কথা হল তার পর দিন সকালে বন্দনা রোজকার মতো মাসির কাছে গেল না। তার চোখে সেই সকালে ছিল অন্ধকার। মটকা মেরে অনেকক্ষণ পড়ে রইল বিছানায়। বেশ বেলা অবধি। কেউ তাকে ডাকতে এল না।

আটটার সময় এল রমা মাসি।

ওমা! তুই এখনও শুয়ে আছিস? কেন রে? শরীর খারাপ নাকি?

রমার করুণ মুখের দিকে চেয়ে সে কিছুতেই ভাবতে পারল না যে, এ একটা রাক্ষুসি। রমা মাসির অসহায় মুখখন দেখলেই এমন মায়া হয়!

রমা মাসি তার পাশটিতে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ওঠ। অনেক বেলা হয়েছে।

মাসি, তুমি করে ফিরে যাবে?

রমা একটু চুপ করে থেকে বলল, এবার যাব। অনেকটা তো ভাল হয়ে গেছি। কেন বল তো! আমি গেলে তোর মন খারাপ লাগবে, না?

হ্যাঁ মাসি। তবে তোমারও তো মাবাবার জন্য মন কেমন করে, তাই না?

মাসি আবার একটু চুপ করে থেকে বলে, করে।

আমি তো মাবাবা ছাড়া থাকতেই পারি না।

রমা মাসি করুণ একটু হেসে বলল, সবাই কি তোদের মতো সুখী? আমাদের কিন্তু তোদর মতো এত ভাব ভাবাসা নেই।

ওমা! কেন মাসি?

আমরা পাঁচ বোন, পাঁচটা গলগ্রহ। আমাদের আদর করবে কে?

যাঃ, কী যে বলো।

ঠিকই বলি। আমরা পাঁচ বোন কী করে হলাম জানিস? বাবা ছেলে-ছেলে করে পাগল, প্রত্যেকবার যেতে চায় আর আমরা একটা একটা করে মেয়ে জন্মাতে থাকি। আমরা হলাম বাবার পটটা হতাশা।

সেই সকালে রমা মাসিকে মন থেকে অপছন্দ করার চেষ্টা করেছিল বন্দনা, কিন্তু ঘেন্নাটা আসতে চাইছিল না।

রমা নাসি তদগত হয়ে জানালার বাইরের দিকে চেয়ে ছলছল চোখ করে বলল, তোদের বাড়িতে কী ভাল আছি বল তো। আমাদের বাড়িতে তো এত আদর নেই। বাবার সামান্য চাকরি। ঘোট বাসা। আমরা পাঁচ-পাঁচটা বোন বেড়ে উঠছি। না রে, তোদর মতো আমরা নই। আমাদের মধ্যে ভাবাসা খুব কম। আমার তো একটুও ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।

ব্যগ্র হয়ে বন্দনা বলল, না না মাসি, ওরকম বোলো না। তুমি ফিরে যাও।

রমা হেসে ফেলল। বলল, তাড়াতে চাস নাকি?

না মাসি, মা বাবাকে ছেড়ে থাকতে নেই। ওঁদেরও নিশ্চয়ই তোমাকে ছেড়ে কষ্ট হচ্ছে!

কে জানে? কষ্ট কেন হবে? কষ্টের কী আছে?

নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারছ না।

রমা তবু মাথা নেড়ে বলল, আমাদের সংসার যদি দেখতিস তা হলে ওকথা বলতিস না। আমরা পাঁচটা বোন ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছি। আদর কে করবে বল! মা রোগা-ভাগা মানুষ, বাবা তো উদয়াস্ত ব্যস্ত। তার ওপর প্রায় রাত্রেই দেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ফেরে। কী সব অসভ্য গালাগাল করে মাকে। আগে মারধরও করত। আমরাও বাবার হাতে অনেক মার খেয়েছি। এখন মারে না, কিন্তু গালাগাল করে। তুই যেমন সুন্দর বাড়িতে, সুন্দর সংসারে বড় হচ্ছিস, আমাদের ঠিক তার উল্টো।

তোমার বাবা মদ খায়?

খায়। দুঃখেই খায় হয়তো। অভাবকষ্টে মাথাটা ঠিক রাখতে পারে না। পাঁচটা মেয়ে এখন গলার কাঁটা। মদ খেলে সেই চাপা দুখ আর রাগ বেরিয়ে আসে।

তোমার তো তা হলে খুব কষ্ট মাসি।

সে কষ্টের কথা তুই ভাবতেও পারবি না। আমার একটুও ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না।

তোমাদের পাঁচ বোনে ভাব নেই?

আছে। আমরা তো সমান দুঃখী, তাই আছে একটু, ঝগড়াও হয় মাঝে মাঝে।

রমার জন্য কষ্ট হওয়ার চেয়ে বন্দনার দুশ্চিন্তাই হয়েছিল বেশি। মাসি যে ফিরে যেতে চাইছে না। যদি ফিরে না যায় তা হলে তো এ বাড়িতে আরও অশান্তি দেখা দেবে।

দুদিন বাদে ফের গভীর রাতে পাশ ফিরতে গিয়ে বাবার স্পর্শ না পেয়ে জেগে গেল বন্দনা। তখন শুনল বারান্দায় মায়ে আর বাবায় কথা হচ্ছে।

মা বলল, তুমি মাঝরাতে উঠে কোথায় যাচ্ছিলে?

বাবা অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিলাম মানে? ঘরে গরম লাগছে, ঘুম আসছে না। তাই একটু বারান্দায় এসেছি।

গরম লাগলে তো পাখা খুলে দেওয়া যায়, জানালা ফাঁক করে দেওয়া যায়, উঠে বারান্দায় আসার দরকার ছিল কি?

বন্দনার বাবা একজন কবির মতো মানুষ। উদাসীন, আনমনা। বাবা কখনও গুছিয়ে বলতে পারে না। সামান্য কারণেই ভীষণ ঘাবড়ে যায়। মায়ের কঠিন শীতল গলায় ওই প্রশ্নের জবাবে বাবা তোতলাতে লাগল, আমি তো একটু খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম, কী দোষ হল তাতে?

খোলা হাওয়ায় দাঁড়ানো না কী সে তুমিই জানো। কোনও দিন তো তোমাকে মাঝরাতে উঠতে দেখি না। গরম তো আগেও পড়ত। আজকাল হঠাৎ মুক্তবায়ুর দরকার বাড়ছে কেন?

তুমি কি কিছু একটা বলতে চাইছ?

চাইছি। তোমার মতলবটা কী?

আমার কোনও মতলব নেই। তুমি আমাকে এত অপমান কোরো না। আমার মরতে ইচ্ছে করছে।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, পুরুষমানুষকে যে বিশ্বাস করে সে বোকা, আমি ও পাপ বিদেয় করতে চাই। তুমি রমার টিকিট কেটেছ?

বাবা স্তিমিত গলায় বলল, শুধু টিকিট কাটলেই কি হয়? সঙ্গে কে যাবে? মধ্যপ্রদেশ অবধি একটা বয়সের মেয়ে কি একা যেতে পারে? আগে চলনদার ঠিক করতে হবে।

মা একটু চুপ করে থেকে বলে, বাহাদুর দেশে যেতে চাইছে। ও সঙ্গে যাক। রমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে দেশে চলে যাবে।

ঠিক আছে। বাহাদুরকে বলে রাজি করাও, আমি টিকিটের জোগাড় দেখছি।

কাল থেকে তুমি বন্দনাকে নিয়ে এ ঘরে থাকবে। আমি রাতে রমার ঘরে শোব। ও ঘরে একটা বাড়তি চৌকি আছে।

বাবা অসহায় গলায় বলল, তোমার যা খুশি করো। সামান্য বারান্দায় আসা নিয়ে যে এত কথা উঠতে পারে জানা ছিল না।

বারান্দায় আসা নিয়ে কথা উঠছে না। বারান্দার ওই কোণে একজন ঢলানি থাকেন। ভাবছি, বুজনে ইশারা ইঙ্গিত হয়ে ছিল কি না।

বাবা শুধু অনুতাপ ভরা গলায় বলল, ছিঃ ছিঃ!

ছিঃ ছিঃ তো আমার বলার কথা।

তুমি বলতে পারছ এসব কথা? তোমার মন সায় দিচ্ছে?

নইলে বলছি কী করে?

এতকাল আমার সঙ্গে ঘর করার পর আমাকে তুমি এই চিনলে?

ঘটনা ঘটলে তবে তো মানুষকে চেনা যায়! তোমাকে নতুন করে এই তো চিনছি। নিজের ওপর তোমার কোনও কন্ট্রোল নেই। তোমাকে ভূতে পেয়েছে।

আর বোলো না, আমার বড্ড গ্লানি হচ্ছে।

বাবা কি কেঁদে ফেলল? গলাটা কেঁপে হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। তার বাবা একজন কবির মতো মানুষ। বাস্তবজ্ঞানবর্জিত, দুর্বলচিত্ত, ব্যক্তিত্বহীন।

বড় কষ্ট হয়েছিল বন্দনার। উঠে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, তুমি কেঁদো না বাবা, তুমি কাঁদলে আমারও যে কান্না পায়।

তারপর মা আর বাবা এসে তার দু পাশে শুয়ে পড়ল। যেন দুটি ঠাণ্ডা পাথর তার দু দিকে। সে যে জেগে আছে তা বুঝতে না দেওয়ার জন্য মড়ার মতো পড়ে রইল বন্দনা। জলতেষ্টা পেয়েছিল, বাথরুম পেয়েছিল, কিন্তু সব চেপে রাখল সে।

পর দিন সকালটা খুব মনে আছে বন্দনার, একটা থমথমে গম্ভীর সকাল। বাবা ঘুম থেকে উঠেই কী একটা ছুতোয় বেরিয়ে গেছে। একটু বেলায় মা একতলার রান্নাঘর থেকে দোতলায় উঠে এল। তখন সামনের বারান্দায় একা চুপ করে বসে ছিল রমা। পাশেই পড়ার ঘরে বন্দনা। বই খুলে খারাপ মন নিয়ে বসে আছে। পড়বার ভান করছে, পড়ছে না। বিলুর সঙ্গে তার ঝগড়া লেগে যায়। বলে বিলুর পড়ার ঘর একতলায়। দোতলাটা সুতরাং নিরিবিলি।

মা বারান্দায় গিয়ে পিছন থেকে বলল, রমা, তুই সব গোছগাছ করে রাখিস। দু একদিনের মধ্যেই ফিরে যাবি।

রমা মাসি যেন চমকে উঠে পিছন ফিরে চেয়ে দিদিকে দেখল। মুখখানা ছাইরঙা হয়ে গেল যেন। অবক গলায় বলল, ফিরে যাব?

ফিরে যাবি না তো কী? এখানে কি পাকাপাকিভাবে থাকতে এসেছিস?

মায়ের গলার চড়া আওয়াজ শুনে রমা আরও একটু অবাক হল। বলল, তা তো বলিনি রেণুদি। ফিরে যাওয়ার কথা আগে বলোনি তো, হঠাৎ বললে বলে বললাম।

হঠাৎ আবার কী? দু মাস তো হয়ে গেছে। রোগও সেরেছে। এখন এখানে বসে থাকার মানেই হয় না। যা, সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নে। তোর জামাইবাবু টিকিট কাটবার ব্যবস্থা করছে।

কার সঙ্গে যাব?

বাহাদুর তোকে পৌঁছে দিয়ে দেশে যাবে।

বাহাদুর! বলে চুপ করে রইল রমা।

বাহাদুর পুরনো বিশ্বাসী লোক। তার ওপর ভরসা করা যায়

আমি থাকলাম বলে তোমাদের বুঝি অসুবিধে হল রেণুদি?

তা সুবিধে-অসুবিধে তো আছেই।

রমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সাদা-হয়ে-যাওয়া ঠোঁটে একটু হাসল। বলল, কাল রাতে আমার খুব জ্বর এসেছে রেণুদি। আমার শরীরটা আজ একটুও ভাল নেই। তুমি আজই যেতে বলছ না তো!

কত জ্বর তোর?

মাপিনি। তবে কাঁপুনি দিয়ে মাঝরাতে জ্বর এল। অনেক জ্বর।

ঠিক আছে। ডাক্তার এসে দেখুক।

ডাক্তার লাগবে না। এরকম জ্বর আমার মাঝে মাঝে হয়। আমার তো পচা শরীর, ঠাণ্ডা লাগলেই বিছানা নিতে হয়। একটু শুয়ে থাকলেই হবে। তুমি ভেবো না, আমি ঠিক গুছিয়ে নেব।

মা গম্ভীর মুখ করে বলল, না, ডাক্তার আসবে। তুই ঘরে যা। আমি ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি।

এ বাড়ির পুরনো ডাক্তার সলিল দাশগুপ্ত এলেন। রুগি দেখে বললেন, টেম্পারেচার তো নেই দেহি। শরীরটা একটু উইক। টনসিল আছে নাকি?

রমা মাসি করুণ গলায় বলল, জ্বর কিন্তু এসেছিল ডাক্তারবাবু। বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে করে বলছি না।

দাশগুপ্ত হেসে বললেন, অবিশ্বাস করছে কে? জ্বর আসতেই পারে। তবে এখন নেই।

মা কঠিন গলায় বলল, জ্বর নানারকম আছে। সব কি আর ধরা যায়!

রমা করুশ গলায় বার বার বলতে লাগল, না রেনুদি, বিশ্বাস করো, আমার সত্যিই জ্বর এসেছিল। অনেক জ্বর।

মা কঠিন গলায় বলল, ঠিক আছে। ওষুধ খাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে চলে গেলেন। মা ফিরে গেল রান্নাঘরে। বন্দনা পড়ার ঘরে। পড়ার ঘরের পাশেই রমা মাসির ঘর। মাঝখানের দরজাটা বন্ধু। পড়ার ঘর থেকে বন্দনা শুনতে পাচিল, রমা মাসি খুব কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, হেঁচকি তুলে।

বাড়িটা বড় থমথমে হয়ে গেল।

দুপুরে উদভ্রান্ত চেহারায় বাবা ফিরতেই মা বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

কাজ ছিল।

কী কাজ?

ছিল।

রমার টিকিটের কী হল?

ব্যবস্থা করে এসেছি।

কবেকার টিকিট? কাকে কাটতে দিয়েছ?

কেদারকে।

কেদার দত্ত নামে বাবার এক বন্ধু আছে রেলে কাজ করে। তাদের টিকিট সে-ই কেটে দেয়।

মা জিজ্ঞেস করল, কবেকার টিকিট?

যবেকার পায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মা আর কিছু বলল না। কিন্তু বাড়িটা থমথম করতে লাগল। স্কুল থেকে ফিরে বন্দনা দেখল, নিজের ঘরে শুয়ে আছে রমা মাসি। সারা দিন খায়নি। তার বাবা কোথায় ফের বেরিয়ে গেছে। বন্দনার বন্ধুর সংখ্যা বরাবরই কম। এ বাড়ির নানারকম বিধিনিষেধ থাকায় সে যখন-তখন বেরোতেও পারে না। তার একমাত্র স্বাধীনতা বাগান আর ছাদ। সেদিন সে একটু ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে ছাদে উঠে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল, পড়ন্ত শীতের শেষবেলায় পশ্চিম দিগন্তের আশ্চর্য বিষয় সূর্যাস্ত। মাথার ওপর মস্ত আকাশ জুড়ে নেমে আসছে আগ্রাসী অন্ধকার।

কী হয়েছে তা সে ভাল জানত না তখনও। নিষিদ্ধ সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট হয়নি। শুধু বুঝতে পারছে রমা নাসি আর বাবাকে নিয়ে একটা কিছু ঘুলিয়ে পাকিয়ে উঠছে। কী হবে এখন? ভেবে একা একা কাদল বন্দনা। বাবাও সারা দিন খায়নি। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে!

বাবা ফিরল সন্ধে পার করে। গলা অবধি মদ খেয়ে এসেছে। চুর মাতাল। কোনও দিন জ্ঞানবয়সে বাবাকে মদ খেতে দেখেনি বনা! কী যে হয়েছিল সেদিন! মনে কষ্ট হলে কি মানুষ মদ খায়?

তবে তার বাবা চেঁচামেচি করেনি, অসংলগ্ন কথাও বলেনি। টলতে টলতে এল, উঠোনেই তিনবার পড়ে গেল দড়াম দড়াম করে। সিঁড়ি বেয়ে উঠল হামাগুড়ি দিয়ে। তাতেও পড়ে গেল। পরে বাহাদুর আর মদনকাকা এসে ধরে ভুলে বড় খাটে শুইয়ে দিল বাবাকে। তারপর বিছানা আর মেঝে ভাসিয়ে বমি করল বাবা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোনোর আগে ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায়। শুধু একবার বলল, যদি গলায় দড়ি দেয় তা হলে কী হবে? সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে না হাজতে?

সেদিন তাকে বাবার কাছে শুতে দেয়নি মা। সে আর মাশুল বিলুর ঘরে। আলাদা খাটে বিলু। সে আর মা একসঙ্গে।

বন্দনার ঘুম আসছিল না ভাল করে। বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছে ঘুম। তার মধ্যেই টের পেল, মা বার বার উঠে বারান্দায় যাচ্ছে। রমা মাসির ঘর থেকে গোঙানির মতো শব্দ আসছিল মাঝে মাঝে। মা বোধহয় কেন গোঙাচ্ছে দেখতে যাচ্ছিল। কিংবা বাবা ও ঘরে যায় কি না।

পরদিন সকালে বিলু তাকে বলল, এ বাড়িতে কী সব হচ্ছে রে দিদি?

বিলু কিছু জানে না। তার তত বাইরের জগৎ নিয়েই বেশি কাটে। বন্দনা গম্ভীর হয়ে বলে, কী আবার হবে? কিছু হয়নি।

বাবা নাকি কাল মদ খেয়ে এসেছে?

তোকে কে বলল?

আমি নীচের তলায় মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছিলাম তো, নিজের চোখে দেখেছি। কী হচ্ছে রে? ফুলুদি যেন কী সব বলছিল। রমা মাসিকে নিয়ে নাকি কী সব গোলমাল হয়েছে।

ফুলুদি এ বাড়ির কাজের মেয়ে। ঠিকে। সেও পুরনো লোক। একটু বোকা হলেও খুব কাজের এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাদের দুই ভাইবোনের ওপর সুযোগ পেলে খবরদারি করতে ছাড়ে না।

বন্দনা ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানে কী হচ্ছে। তোর অত জেনে কী হবে?

বিলু গম্ভীর হয়ে বলল, এ বাড়িতে কেউ আমাকে কিছু বলতে চায় না। এটা খুব খারাপ নিয়ম। রমা মাসি নাকি চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ। গেলে বাঁচি।

কিন্তু রমা মাসি তো খুব ভাল। আমাকে কত গল্প বলে।

ছাই ভাল।

রমা মাসি সকালে উঠল। শরীর অসম্ভব দুর্বল। তাই নিয়েই বাক্স গোছতে বসল। খোলা দরজা দিয়ে বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে দেখছিল বন্দনা। গোছানোর মতো তেমন কিছু আনেনি মাসি। সামান্যই কখানা কাপড়চোপড়। তবে মা বেশ কয়েকখানা শাড়ি দিয়েছিল মাসিকে। সেগুলো মাসি সরিয়ে সাজিয়ে রাখল বিছানায়, বাক্সে ভরল না।

বেলা দশটা নাগাদ মা ওপরে উঠে এল। সোজা গিয়ে রমা মাসির ঘরের দরজায় দাঁড়াল। বলল, খাবি আয়। না খেয়ে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। তুই উপোস করছিস আর উনি মাতাল হয়ে ফিরছেন। প্রেমের জ্বালা তো দেখছি সাতিক।

রমা মাসি বসে ছিল মেঝেতে। পাশেই খাট। মাসি মাথাটা বিছানায় নামিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল, কেন অমন করে বলছ রেণুদি? আমি কী করেছি?

মা ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, কী করেছিস তাও কি বলে দিতে হবে? সর্বনাশী! যা করেছিস তা রাক্ষুসি ছাড়া কেউ করে? এখন দয়া করে এখানে দেহত্যাগ কোরো না। আত্মহত্যা করতে হলে নিজের জায়গায় গিয়ে কোরো। এখন উঠে দয়া করে দুটি গেলো, আর আমাকে রেহাই দাও।

দৃশ্যটা আজও ভোলেনি বন্দনা। রমা মাসি চোখের জলে ভাসা মুখখানি তুলে বিকৃত গলায় বলল, খাব রেণুদি, না খেয়ে যাব কোথায়? চলো, যাচ্ছি।

নীচের খাওয়ার ঘরে মায়ের পিছু পিছু দুর্বল ধীর পায়ে নেমে গেল রমা মাসি। পিছনে চুপি চুপি বন্দনাও! একটু দূর থেকে, দরজার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বন্দনা দেখল, রমা মাসি প্রাণপণে রুটি গিলবার চেষ্টা করছে, কাঁদছে, জলের গেলাস মুখে তুলছে। বিষম খাচ্ছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল মাসির। দুই গাল ফুলে আছে রুটির দলায়। গিলতে পারছে না। তবু কী প্রাণান্তকর চেষ্টা। শেষ অবধি পারল না। বেদম কাশি, বিষম, বমি সব একসঙ্গে ঘটল। মাসি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে চেয়ার-সমেত।

বন্দনা ভয়ে পালিয়ে এল।

পরে শুনেছে, মা ওই অবস্থায় মাসিকে রুটি বেলার বেলন দিয়ে বেদম মেরেছিল। ফুলুদির সামনে। ফুলুদিই পরে বলে, ওভাবে মারা ঠিক হয়নি মায়ের। ওভাবে কেউ মারে?

রমা মাসি অবশ্য মরেনি। শব্দ পেয়ে বাদুর দৌড়ে এসে মাসিকে তুলল। চোখেমুখে জল দিল। আঙুল দিয়ে মুখ থেকে রুটির দলা বের করল। তারপর ধরে ধরে দোতলায় এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। শূন্য দৃষ্টি কাকে বলে সেই ধন দেখেছিল বন্দনা। মাসি শুয়ে আছে

খাটে। নিস্পন্দ। শুধু চোখ দুটি খোলা। সেই চোখে পলকও পড়ছে না, অথচ কিছুই যেন দেখতেও পাচ্ছে না।

আজও সেইসব দিনের কথা ভাবলে রমা মাসির জন্য কষ্ট হয় বন্দনার। অপরাধ যতই হোক, শাস্তি দেখতে কারই বা ভাল লাগে!

বাবা উঠল অনেক বেলায়। চোখ মুখ ফোলা, কেমন, উদভ্রান্ত চেহারা। ঘুম থেকে উঠেই তাকে ডাকল বাবা, বন্দনা মা, কোথায় তুমি?

বন্দনা ছুটে গিয়েছিল, এই তো বাপি।

তার বাবা চারদিকে পাগলের মতো চেয়ে দেখছিল। বলল, আমার কেমন লাগছে। একটু জল দেবে?

রাতে কেউ খাটের পাশে টুলে কাল জল রাখেনি। বন্দনা জল এনে দিতেই বাবা মস্ত কাঁসার গেলসটা প্রায় এক চুমুকে খালি করে দিয়ে বলল, আমার কি জ্বর? গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো!

গায়ে হাত দিয়ে বন্দনা চমকে গেল। বাবার খুব জ্বর। বলল, হ্যাঁ বাপি।

আমার খুব শীত করছে।

তা হলে শোও বাপি, আমি গায়ে ঢাকা দিয়ে দিই।

না না। আমাকে এখনই স্নান করতে হবে।

জ্বর-গায়ে স্নান করবে?

হ্যাঁ মা। আমার গা বড় ঘিন ঘিন করছে।

তা হলে যে তোমার জ্বর আরও বাড়বে।

না, কিছু হবে না। এই বলে বাবা গিয়ে কলঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বন্দনা শুনতে পেল বাবা মগের পর মগ জল ঢালছে গায়ে। পাগলের মতো। দরজায় অনেকবার ধাক্কা দিল বন্দনা, বাবা, আর নয়।

বাবা শুনল না। অনেকক্ষণ বাদে যখন বাবা গা মুছে বেরিয়ে এল তখন শীতে চড়াইপাখির মতো কাঁপছে। ছোট দুই হাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় নিয়ে এল বন্দনা। গায়ে ঢাকা দিল। বলল, কেন স্নান করলে বাবা? তোমার যে জ্বর!

বড্ড ঘিন ঘিন করে যে! বড্ড ঘিন ঘিন।

বিকেলে যখন জ্বর মাত্রাছাড়া হল তখন ডাক্তার দাশগুপ্ত এলেন। বললেন, এ তো সাঙ্ঘাতিক কনজেশন দেখছি বুকে! নিউমোনিয়ায় না দাঁড়িয়ে যায়।

নিউমোনিয়াই দাঁড়াল শেষ অবধি।

অন্য ঘরে তখন রমা মাসি দিনের পর দিন চুপ করে শুয়ে বসে থাকছিল। কেদার দত্ত টিকিট নিয়ে আর এল না। কয়েকদিন পর মাসিকে নীচের একটা এঁদো ঘরে চালান দিল মা। বলল, ওপরে এসো না। নীচেই থেকো। আর ঘরের দরজা আটকে রাখবে সব সময়ে।

মাসি নীরবে এই নিয়ম মেনে নিল।

মা একটা পোস্টকার্ড লিখল মধ্যপ্রদেশে।

কয়েকদিন বাদে রমা মাসির মায়ের কাছ থেকে জবাব এল মা রেণু, রমাকে নিয়ে কি তোদের খুব অসুবিধা হচ্ছে? রমা বড় শান্ত মেয়ে। তার পিসেমশাই ছুটি পেলেই গিয়ে নিয়ে আসবে। চিন্তা করিস না।

বাবার অসুখ সারল একদিন। কিন্তু সারল না বাড়ি থমথমে ভাবটা। কয়েকটি মাত্র প্রাণীর বাস, তবু একজন যেন অন্যদের থেকে কত দূর।

মা একদিন মধ্যরাতে ফের বাবাকে ধরল, তোমার কেদার দরে কী হল? টিকিট নিয়ে এল না

হয়তো ভুলে গেছে।

আর কত মিথ্যে কথা বলবে বলো তো?

মিথ্যে কথা বলে বাবা কেন তটস্থ হয়ে পড়ল।

মিথ্যে নয়? কেদার দত্তের কাছে তুমি যাওইনি কখনও।

যাইনি।

ডাইনির পাল্লায় পড়লে মানুষের কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে? ও তো তোমাকে খেতে এসেছে। তোমাকে খাবে, এ সংসার উড়িয়ে-পুড়িয়ে খাক করবে।

বাবা চুপ করে রইল। অন্ধকারে বাবার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না বন্দনা। কিন্তু তার খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। তার বাবা একজন অসহায় মানুষ। কবির মতো মানুষ।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল এক মধ্যরাতে, মা আর বাবার কথাবার্তা সেদিন ঘুম ভেঙে শুনে ফেলেছিল বন্দনা। সেই ঘটনার মাস দুই বাদে একদিন সত্যিই মাসির টিকিট কাটা হল। বাহার তৈরি হ সঙ্গে যাবে বলে।

তখন সন্ধেবেলা, রাত সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতে হবে বলে মাসি কাপড় পরে তৈরি হল। ভাতও খেয়ে নিল। হঠাৎ বাবা মাকে বলল, রেল, তুমি ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসো।

কেন?

নইলে খারাপ দেখাবে।

দেখাক।

নইলে আমাকে যেতে হয়।

তুমিই যাও।

যাব? তোমার তো ফের সন্দেহ হবে।

সন্দেহ! সন্দেহের কিছু নেই। তোমরা দুজনেই পাপী। যাও তোমার তো চুলকুনি আছে।

কী যে বলো। শুনলে ও কী মনে করবে?

কী আবার মনে করবে? ওর মনে করার ভয় করি নাকি? যা সত্যি তাই বলছি।

বাবা একটু ইতস্তত করে বলল, চলেই তো যাচ্ছে। সব ভুলে যাও। বড় সামান্য কারণেই এত কাণ্ড হয়ে গেল।

আমার কাছে কারণ সামান্য নয়।

বাবা হতাশ হয়ে বলল, তুলে দিয়ে আসি। নইলে কথা থাকবে।

যাও, কিন্তু আবার ট্রেনে চড়ে বোসোনা। তোমার যা অবস্থা দেখছি।

এইসব ঠেস-দেওয়া কথার পরও কিন্তু বাবা গিয়েছিল স্টেশনে। গিয়েছিল, কিন্তু ফেরেনি, আজও ফেরেনি।

রাত নটার পর বাহাদুর ফিরে এসে বলল, দিদিমণি তো হাওয়া।

মা চেঁচিয়ে উঠে বলল, তার মানে?

কিছু বুঝলাম না।

কী বুঝলে না?

গাড়িতে ওঠার পর বাবু আমাকে বললেন, ওরে রাস্তার খাবার দিতে ভুলে গেছে একটা পাউরুটি নিয়ে আয় দিদিমণির জন্য, আমি পাঁউরুটি আনতে গেছি, এক মিনিট হবে, এসে দেখি দিদিমণি নেই, বাবুও নেই। সুটকেসও নেই। একজন প্যাসেনজার বলল, ওরা পিছনের দরজা দিয়ে নেমে গেছে।

সে কী?

আমি একটু ভাবনা করে নেমে পড়লাম, ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই।

মা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে উবু হয়ে বসে পড়ল, শুধু বলল, এও হয়? হতে পারে?

বাহাদুর তার মালপত্র রেখে মদনকাকাকে নিয়ে ফের স্টেশন-চত্বর খুঁজতে গেল, যদি কোথাও পাওয়া যায়।

চিরকুটটা পাওয়া গেল শোওয়ার ঘরের কাশ্মীরি গোল টেবিলটার ওপর। একটা কাঁচের গেলাসে চাপা দেওয়া একসারসাইজ বুকের একটা রুল-টানা পাতায় শুধু লেখা, আমাদের খুঁজো না, পাবে না।

কিন্তু ঘটনার প্রথম ধাক্কাটা সামলে মা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বাঘিনীর মতো তার চেহারা, দাঁতে দাঁত পিষে শুধু বলতে লাগল, এত সহজে ছেড়ে দেব? এত সহজে ভেঙে দিয়ে যাবে আমার। সংসার?

সুতরাং পাড়া প্রতিবেশী এল, পুলিশ এল, দু-একজন নেতাও এলেন। তাঁদের মধ্যে সুবিমল স্যার। প্রদীপের মৃত্যুর পর থেকে সুবিমল স্যারকে একদমই পছন্দ করত না মা, নাম শুনলেই রেগে যেত। কিন্তু এ ঘটনার পর সুবিমল স্যার খুবই কাজে লাগলেন। তাঁর

দলের ছেলেরা সারা শহরে তোলপাড় করে বেড়াল দুজনের খোঁজে। সারা শহরে ঢি ঢি। তারা ভাই বোন স্কুলে অবধি যেতে পারত না লজ্জায়।

সেইসব দিন খুব মনে আছে বন্দনার। বাইরের এইসব ঘটনাবলি তাকে আরও ভয় পাইয়ে দিত, সে গুটিয়ে যেত নিজের মধ্যে। বুকটা কী ভীষণ টনটন করত বাবার জন্য। তার ভাল মানুষ, কবির মতো বাবার এ কী হল? এখন সে কী করে থাকবে বাবা ছাড়া?

মাঝরাতে একদিন ঘুম থেকে তাকে ঠেলে তুলে মা বলল, রাক্ষুসি, ঘুমের মধ্যে কার নাম করছিলি?

অবাক বন্দনা ভয় খেয়ে বলল, কার মা?

খবরদার ও নাম আর উচ্চারণ করবি না, বাবা! কীসের বাবা রে? জন্ম দিলেই বুঝি বাবা হয়? এত সহজ!

এই বকুনির অর্থ কিছুই বোঝেনি সে। শুধু বুঝল সে ঘুমের মধ্যে বাবাকে ডেকেছিল।

মাসির কথাও কি মনে হত না তার? খুব হত। দুঃখী, বোগা মেয়েটা সেই যে সকালে মায়ের তাড়া খেয়ে গিয়ে গোগ্রাসে রুটি খাচ্ছিল, সেই দৃশ্য কি ভোলা যায়? মাসিকে তো একসময়ে সে ভীষণ ভালবাসত। দু একদিন গল্প করতে করতে এক খাটে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রথম প্রথম। মাসির প্রথম আসার পর কী আনন্দেই তাদের কাটত। এই মস্ত বাড়িটায় একজন নতুন এলে তাদের এমনিতেই ভাল লাগে। তার ওপর মাসির মতো অমন মিশুকে মিষ্টি মানুষ। তারপর কী যে হয়ে গেল।

আজ অবধি মাসিকে পুরোপুরি ঘেন্না করতে পারে না বন্দনা। কিছুতেই পারে না। আর বাবাকে সে.আজও অন্ধের মতো ভালবাসে। তবু দুজনকে একসঙ্গে ভাবলে তার কষ্ট হয়। কেন এরকম করল বাবা?

দিন সাতেক বাদে রমা মাসির মা এল আর এক মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। বাবা আসতে পারল না, তার নাকি ছুটি নেই। সেই দিদা এসে অনেক কান্নাকাটি করল, রেণু, তোর সর্বনাশ করল আমার পেটের মেয়ে। গলায় দড়ি দিলেও কি এ জ্বালা জুড়োবে?

মা কাঁদতে কাঁদতে আর ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, সে শুধু আমার সর্বনাশই করেনি ফুলপিসি, একটা গোটা সংসার ছারখার করে দিয়ে গেছে। আমার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল। বাইরের সমাজে মুখ দেখানোর উপায় রইল না। কেন যে সর্বনাশীকে এ বাড়িতে পাঠাতে গেলে!

দিদাও হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার জ্বালা যদি বুঝতিস রেণু! একটা পাঁড় মাতালের ঘর করি, ঘাড়ের ওপর পাঁচটা সোমথ মেয়ে। কী সুখে আছি বল! তার ওপর এই মেয়ে মুখে চুনকালি দিয়ে গেল। গলায় দড়ি জুটল না ওর?

সারাদিন ধরে থেকে থেকে এইসব বিলাপ। লোকটিকে আগে কখনও দেখেনি। রোগাভোগা মানুষ, সরল সোজাও বটে। দিদাকে তার খারাপ মানুষ মনে হয়নি। রমা মাসির সেজদি ক্ষমাও খুব ভাল। দেখতে রমার মতো নয়। একটু মোটাসোটা আহ্লাদি চেহারা। তবে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল, মুখখানা দুঃখে ভার।

বন্দনাকে বলেছিল, আমাদের বোনে বোনে খুব ভাব ছিল। রমা সবচেয়ে নরম মনের মেয়ে। হ্যাঁ রে, কেন এরকম হল? রমা তো এরকম ছিল না।

বন্দনা কান্না চেপে বলেছিল, আমি জানি না মাসি।

জামাইবাবুকে তো আমি কখনও দেখিনি। তবে শুনেছি উনিও খুব ভাল মানুষ।

আমার বাবা খুব ভাল।

ক্ষমা মাসির সঙ্গে তার তেমন ভাব হল না বটে, কিন্তু বন্দনার এই মাসিটিকে খুব খারাপ লাগল না। তার ওপর একটা লজ্জার ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তারা খুব মনমরা।

হীরেনবাবু তখন প্রায় রোজ বিকেলের দিকে আসতেন এবং মেঘনাদকে শিগগিরই অ্যারেস্ট করে আনবেন বলে তড়পাতেন। তাঁকে চা-বিস্কুট আর জদা পান দেওয়া হত। তিনি মাঝে মাঝেই মাকে জিজ্ঞেস করতেন, মেঘনাদবাবু নগদ টাকা কত নিয়ে গেছে বলে আপনার মনে হয়? গয়না টয়না নেয়নি তো!

বন্দনার খুব রাগ হত শুনে। তার বাবা কি চোর?

দিদা একদিন হীরেনবাবুকে বলল, জামাই আমার হিরের টুকরো ছেলে। ওর কোনও দোষ নেই। আপনি আমার মেয়েটাকে চুলের কুঁটি ধরে নিয়ে এনে ফেলুন। আমি ও পাপের বোঝা নিয়ে ফিরে যাই। রেণুর সংসারটা বাঁচুক। ওর মুখের দিকে যে চাইতে পারি না।

হীরেনবাবু বিজ্ঞের মতো হেসে বলেছিলেন, ব্যাপারটা যদি অত সহজ হত তা হলে তো কথাই ছিল না, অ্যারেস্ট করতে হলে দুজনকেই করতে হবে। বাইগ্যামির চার্জে।

ফুলদিদা আর ক্ষমা মাসি প্রায় মাস খানেক ছিল। দুজনেই বেশ সরল আর ভালমানুষ গোছের। তারা অষ্টপ্রহর মাকে সান্ত্বনা দিত আর রমা মাসির নিন্দে করত।

কিন্তু রমা মাসির একার দোষ বলে মনে হত না বন্দনার। রমা মাসি তো খারাপ ছিল না। কিন্তু সংসারে বোধহয় অদৃশ্য ভূত কিছু আছে। তারাই ঘাড়ে এসে চাপে কখনও সখনও।

দিদা আর মাসি চলে যাওয়ার পর একদিন কেদারকাকু এসে খবরটা দিলেন, মেঘনাদ বড় আত্মগ্লানির মধ্যে আছে বউঠান। ছেলে মেয়ের জন্য বড় কান্নাকাটি করছে। আপনার কথাও খুব বলছে।

মা খুব শান্ত গলায় বলল, উনি কোথায় আছেন?

প্রথমটায় আমার কোয়াটারেই গিয়ে উঠেছিল। পরে একটা বাসা ঠিক করে উঠে যায়। তবে রোজই আসে। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। কেন যে এ কাজ করল। সবই ভবিতব্য।

আজ সকালের ঝলমলে রোদে চারদিক যেন ভেসে যাচ্ছে আনন্দে। আজ পুরনো দুঃখের কথা ভাবতে নেই। শুধু সুখ বা দুঃখের সময় বন্দনার মনে হয় এখন বাবা থাকলে কেশ হত। বুকের ভিতরটা টনটন করে তখন।

পায়রারা চক্কর খাচ্ছে মাথার ওপর। এ বাড়ির পোষা পায়রা। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে। আকাশের গায়ে যেন এক অঞ্জলি ফুল।

এরকম কত ঐশ্বর্য দিয়ে যে পৃথিবীটা সাজানো! একটা ফুলের দিকে চেয়ে থাকলেও আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তাকে দেখতে শেখাত বাবা। বাবার চোখ ছিল কবির মতো। স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত। বাবা বলত, এ পৃথিবীর রূপের যেন শেষ নেই। জানালা দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে, তাতে ঝিরিঝিরি নিমের ছায়া, ভাল করে দেখিস, কী অদ্ভুত সুন্দর। নিবিষ্ট হয়ে নিবিড়ভাবে দেখতে হয়।

বাবা ছিল এক কবির মতো মানুষ, বাবা কি আজও সেরকম আছে? কে জানে। রমা মাসিকে নিয়ে সেই যে চলে গেল বাবা, গেল তো গেলই।

২. বাঁশের সাঁকো

বাঁশের সাঁকোটার মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অতীশ। তার মাথায় এক বস্তা বেগুন। সে বি-কম পাশ। দিন চারেক আগে সকালে দৌড়োনোর সময় তার ডান কুঁচকিতে একটা টান ধরেছিল। অন্য কেউ হলে বসে যেত। সে বসেনি। নিজেকে চালু রেখেছে। বসলে তার চলবে না। কিন্তু ব্যথাটা আজও সাতবাতিক আছে। ডান পায়ে বেশি ভর দিতে পারে না। এমন চিড়িক দেয় যে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি টের পাইয়ে ছাড়ে। বেশি ব্যথায় একটা অবশ ভাব হয়, আর মাংসপেশি শক্ত হয়ে গুটলি পাকিয়ে থাকে। এসব নিয়েই চলা।

বাঁশের সাঁকোটা পার হওয়া খুব সহজ নয়। দুখানা বাঁশ পাশাপাশি ফেলা, একধারে বাঁ পাশে। একখানা নড়বড়ে রেলিং। পরান আগেই বলে রেখেছে, ধরার বাঁশটায় বেশি ভর দেবেন না। ওটা শুধু টাল সামলানোর জন্য।

আসার সময়ে ভাবনা হয়নি। তরতর করে পেরিয়ে এসেছে। তখন মাথায় পঁচিশ কেজির বেগুরে বস্তা ছিল না। এখন সেটা টলমল করছে মাথায়। তার ওপর পায়ে হাওয়াই চটি। গত রাত্তিরে বৃষ্টিতে গাঁ-গঞ্জে কাদা ঘুলিয়ে উঠেছে। গোড়ালি অবধি এঁটেল মাটিতে মাখামাখি। জামা প্যান্টের পিছনে, মাথা অবধি হাওয়াই চটির চাঁটিতে ছিটকে উঠেছে কাদা। এখন সেই পিছল হাওয়াই। চটি পায়ে সাঁকো পেরোনোর অগ্নিপরীক্ষা।

পরান পিছনেই। ঘাড়ে শ্বাস ফেলে বলল, আপনি পেরে উঠবেন না। দাঁড়ান, আমার বস্তাটা ওপারে রেখে এসে আপনারটা পার করে দিই।

অতীশ পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি পারলে আমি পারব না কেন?

সবাই কি সব পারে?

জীবনসংগ্রাম কাকে বলে জানো? এই সংগ্রামটা নিজেই করতে হয়। সব জায়গায় তো আর পরানচন্দ্র দাসকে পাওয়া যাবে না।

পরানের পায়েও হাওয়াই চটি, লুঙ্গিটা অর্ধেক ভাঁজ করে ওপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে বলে বা ঠ্যাংদুটো দেখা যাচ্ছে। গায়ে একটা হাওয়াই শার্ট। পরান বেঁটে এবং খাঁটিয়ে পিটিয়ে তোক। ইসল। বলল, বেগুন নিয়ে যদি পড়েন তো বেগুনও গেল, আপনিও গেলেন। আমার অভ্যাস আছে। একটু দাঁড়ান।

এই বলে পরান অতীশকে ডিঙিয়ে সাঁকোতে উঠে পড়ল। ওপাশ থেকে বিড়ি মুখে একটা লোক সকোতে উঠতে গিয়ে পরানকে দেখে সরে দাঁড়াল।

অতীশ নিবিড় চোখে পরানকে লক্ষ করছিল। কায়দাটা কি খুব কঠিন? বাঁশে একটা মচমচ শব্দ হচ্ছে, একটু একটু দেবেও যাচ্ছে। পরান একটা আলতো হাত বাঁশের রেলিঙে রেখে পা দুটো সামান্য ঘসটে ঘসটে পেরিয়ে যাচ্ছে। ওর বস্তায় ত্রিশ কেজির মতো বেগুন।

অতীশ দেরি করল না। ঠাকুর স্মরণ করে অবিকল ওই কায়দায় সাঁকোতে উঠে পড়ল। বাঁশের সাঁকোতে একটা ম্যাক করে জোর শব্দ হল। একটু কাঁপল কি? পরান নয়, ওপাশের লোকটা হঠাৎ হেকে বলল, দাঁড়াও বাপ, দুজনের ভর সইবে না। আক্কেল নেই তোমার?

আড়চোখে খালের দিকে চাইল অতীশ। ছোট খাল। জল কম, কিন্তু কাদা থিকথিক করছে। পড়লে গলা অবধি গেথে যাবে।

সাঁকোর ওপর দু কদম এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অতীশ। পরান ওপারে পা দিতেই সেও ধীরে ধীরে পা ঘসটে ঘসটে এগোতে থাকে। বাঁ হাতে আলতো করে রেলিং ধরা। পারবে না? এসব না শিখলে তার চলবে কেন?

ওপার থেকে পরান বলল, কথা শুনলেন না তো! পারবেন কি? নইলে বলুন, আসি।

না। পারব।

পারার জন্য যেটা দরকার সেটা হল অখণ্ড মনোযোগ। পা যাতে বেচাল না পড়ে আর শরীর যাতে হেলে যায়। ডান কুঁচকিটা ঠিক থাকলে কোনও চিন্তা ছিল না। কিন্তু টাটানিটা যেন বাড়ল সাঁকোর মাঝবরাবর এসে। অবশ লাগছে, দুর্বল লাগছে ব্যথার জায়গাটা। দাঁতে দাঁত চেপে সে মনে মনে বলল, যতই কামড়াও আমি ছাড়ছি না। তুমি ব্যাটা আমার চাকর, যা বলব শুনতে হবে।

ডান কুঁচকি এই ধমকে ভয় পেল বলে মনে হয় না। তবে অতীশ মাঝ-সাঁকো থেকে সামান্য ঢালে সাবধানে পা রাখল। বড় নড় করছে সাঁকোটা, এত ওজন তার যেন সওয়ার কথা নয়।

হড়বড় করবেন না, ধীরে সুস্থে আসুন। নীচের বাঁশে দড়ির বাঁধন আছে, বাঁশের গিট আছে, সেগুলোর ওপর পা রাখুন। পা একটু আড় ফেলবেন। দুই বাঁশের মাঝখানে পা ফেললে বাঁশ ফাঁক হয়ে পা ঢুকে যেতে পারে। পুরনো বাঁধন তো, তার ওপর মাথায় অত ওজন।

পরান বরাবরই একটু বেশি বকবক করে। এসব কি আর সে জানে না? প্রাণের দায়েই জানে। প্রাণের দায়ই তো যত আবিষ্কারের মূল।

ঢালের মুখে ডান পা একটু পিছলে গেল হঠাৎ। বুকটা কেঁপে উঠে মাথা অন্ধকার হয়ে গেল তার। এই রে! গেলাম!

কিন্তু পাটা একটা বড় বাঁধনের দড়িতে আটকাল। বস্তাটা একটু দুলে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে দোলটা সামাল দিল অতীশ। তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগল। শালার ডান কুঁচকি কুকুরের মতো কামড়াচ্ছে। জায়গাটা ফুলে উঠল নাকি?

একেবারে শেষ দিকটায় পরান এগিয়ে এসে বস্তাটা ধরল।

অতীশ একটু রেগে গেল। অযাচিত সাহায্য সে পছন্দ করে না। বলল, ধরলে কেন? পেরিয়েই তো এসেছিলাম।

পরান অতীশকে চেনে। একটু ভয়ও খায়। বলল, একেবারে শেষ সময়ে মাঝে মাঝে ভরাডুবি হয় যে।

ইংলিশ চ্যানেল পেরোনোর সময় কোনও সাঁতারুকে স্পর্শ করা বারণ। করলেই সেই সাঁতারু ডিসকোয়ালিফায়েড। এইরকমই শুনেছে অতীশ। তার মনে হল, এই সাঁকো পেরোনোতেও সে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে গেল পরানের জন্য।

পরান তার বস্তাটা নামিয়ে রেখেছিল। তুলতে গিয়েও থেমে বলল, আপনি বড্ড ঘামছেন। একটু জিরিয়ে নেবেন নাকি?

অতীশ টের পাচ্ছে তার ডান পা থরথর করে কাঁপছে। কুঁচকির ব্যথার জায়গাটা জ্বলছে লঙ্কাবাটার মতো। আর মাইলটাক বয়ে আনা বেগুনের বস্তার ভারে কাঁধ ছিঁড়ে পড়ছে। তবু বলল, আমার জিরোনোর দরকার নেই।

পরান বলল, আরে, তাড়া কীসের? গাড়ি সেই ছটায়। একটু বিড়ি টেনে নিই। দিন বস্তাটা ধরে নামাই। পট করে ফেলবেন না যেন। চোট লাগলে বেগুন দরকচা মেরে যায়।

বস্তাটা নামিয়ে ঘাসজমির ওপর রাখল অতীশ। তারপর চারদিকে চাইল। বেশ জায়গাটা। উঁচু মেটে রাস্তার দুধারে পতিত বুনো জমি। বসতি নেই। গাছপালা আর এবড়ো খেবড়ো জমি।

লোকটা খাল পেরিয়ে ওধারে চলে গেছে। চেয়ে দেখছিল অতীশ। ওপাশে আবাদ। কত লোক কত ভাবে বেঁচে আছে।

পরান পথের ধারে হেলানো বাকলা গাছের গোড়ার ওপর বসে বিড়ি ধরিয়েছে। বিড়ি ধরানোটা অছিলা। এই ফাঁকে অতীশকে একটু জিরেন দিতে চায়। ও কি ভাবে অতীশ কমজোরি, পরেসান? এইটেই অতীশ সহ্য করতে পারে না। সে কি ওর করুণার পাত্র?

পরান বিড়ি খেতে খেতে বলল, এ আপনার পোষাবে না বাপু। এই গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে গিয়ে পাবেন ক পহা? বরং পুরুগিরিতে লাভ।

পরানের কথায় কান না দিলেও চলে। পরান হচ্ছে নীচের তলার লোক। ওর সমস্যা কম। দেহখানি পাত করে ওকে খেতে হয়। ভদ্রলোকদের গতর খাটাতে দেখলে ও ফুট কাটবেই।

অতীশের রিক্সা গত এক সপ্তাহ নেই। পুজোপাটেরও বরাত নেই। সংসারটা চলে কীসে? পরান বলল, ভুবনডাঙার বেগুন এনে বেচলে কেজিতে দু টাকা চার আনা করে লাভ। তাই আসা।

পরানের সঙ্গে তার তফাত হল, পরানের রাস্তাটা সিধে। সে গাঁয়ে গঞ্জে বন্দোবস্ত করে আসে। হপ্তায় হপ্তায় গিয়ে মাল খরিদ করে আনে। তারপর বেচে। তার ওইতেই হয় বা চলে যায় বা চালিয়ে নিতে হয়। আর অতীশের হচ্ছে দু নৌকো সামাল দিয়ে চলা। তারা বামুন, গরিব। অথচ ভদ্রলোকও। সে যে বিকম পাশ এটা আর এক ফ্যাকড়া। তাই পরানের মতো তার রাস্তা তত সরল নয়।

অতুলবাবুর মেয়ে শিখা গাড়ি চালাচ্ছিল। স্টেশনে একটা ট্রিপ মেরে সওয়ারি নিয়ে ফিরছিল অতীশ। সে ঠিক জানে শিখা লাইসেন্স পেলেও হাত এখনও ঠিক হয়নি। চালপট্টির মধ্যে সরু রাস্তায় শিখার গাড়ির বনেট তার বাঁ দিকের চাকায় লেগে রিক্সা উল্টে দিল। শিখা বাচ্চা মেয়ে, তার দোষ দেয় না অতীশ। কিন্তু দোষ বাড়ির লোকের, কেন ওইটুকু মেয়ের হাতে গাড়ি ছেড়ে দেয়? রিক্সাটা গেল ভোগে! সওয়ারি একটা যুবক ছেলে, অ্যাকসিডেন্টের সময় চটপট লাফ মেরে নেমে গিয়েছিল। তার লাগেনি। হইহই হল বটে, কিন্তু অতুলবাবুর মেয়ে বলে কথা! তার সাত খুন মাপ।

রিক্সা ভাঙায় মনোজবাবু রেগে আগুন। রিক্সা বন্ধ হয়ে গেল। পরান বলেছিল, যান না, অতুলবাবুর কাছে একবার গিয়ে দাঁড়ান। ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু দিলেও দিতে পারে।

ওসব করে কী হবে? দুপচটা কটু কথা বলবে বোধহয়। দয়া করে যা দেবে তাতে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। থাকগে।

বামুন তো, বুদ্ধি আর কত হবে? আমরা হলে আদায় করে ছাড়তাম।

ওইটেই মুশকিল। সে পরান নয়, আবার পরানের চেয়ে উঁচুও নয় পয়সার দিক দিয়ে।

দু পুরুষ ধরে ভাঙনটা শুরু হয়েছে। বাবাই প্রথম ভদ্রলোকের মুখোশটা খুলে বাজারে আলুর স্টল খুলেছিল। আলু বিক্রি বারো মাস। দরও বাঁধা। আয়ও বাঁধা। গলায় পৈতে নিয়ে তার বাবা পঁচিশ বছর আলু বেচছে, আবার পালপার্বণে পুজোও করে আসছে। তাতে সংসারের সুসার কিছু হয়নি। তারা খোলার ঘরে ভাড়া থাকে। কোনওরকমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

অতীশের বড় দুই দিদির কারও চাকরি হয়নি। ঘরে বসে পোশাক তৈরি করে বিক্রি করে। ছোট এক ভাই আর বোন স্কুলে পড়ে।

স্কুলে কলেজে অতীশ ভাল দৌজাজ বলে নাম করেছিল। ক্লাস থ্রি থেকে সব ফ্ল্যাট রেসে ফার্স্ট। ফিনফিনে পাতলা শরীরে সে যে এত ভাল দৌড়োয় তা তাকে দেখলে বিশ্বাস হয় না। অতীশের খুব ইচ্ছে ছিল, দৌড়ে নাম করবে, চাকরি পাবে। কিন্তু হল কী অনেক ঘোরাঘুরি করেও সে কলকাতার কোনও অ্যাথলেটিক ক্লাবে ঢুকতে পারল না। কেউ পাত্তাই দেয় না তাকে। মহকুমা আর জেলাস্তরে কিছু নাম হয়েছিল। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তবে সে চেষ্টা ছাড়েনি। এখনও সে ভোররাতে উঠে দৌড়োয়, প্র্যাকটিস বজায় রাখে। দিন সাতেক আগে স্ট্যামিনা বাড়ানোর জন্য সে একটা রেললাইনের টুকরো দড়ি দিয়ে কোমরের সঙ্গে বেঁধে সেটাকে ছেড়ে দৌড়োনোর চেষ্টা করেছিল। বেহিসেবি আন্দাজের ফল যা হয়। লোহাটা ছিল দারুণ ভারী। দৌড়োতে গিয়ে খিচ লেগে যায়।

কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে কুঁচকির ব্যথাটা কমানোর চেষ্টা করল অতীশ। ব্যথা কমল বলে মনে হয় না। তবে ঘাড়ে বোবা নেই বলে একটু আরাম লাগছে।

বিড়ি শেষ করে পরান বলে, চলুন, রওনা হই। এখন না বেরোলে গাড়ি পাব না।

ঠিক আছে। চলো।

বস্তাটা ধরে মাথায় তুলে দেব কি? না কি সম্মানে লাগবে?

সম্মানে লাগবে।

তা হলে নিজেই তুলে ফেলুন।

বোঝাটা নামানোর পর ঘাড়ে টনটনানিটা টের পেতে শুরু করেছে অতীশ। এর আগেও অন্যান্য আবাদ থেকে বার কয়েক বজি নিয়ে গেছে। তবে ব্যাপারটা তার এখনও অভ্যাস হয়নি। পরান বলে, ধীরে ধীরে ঘাড় শক্ত হয়ে যাবেন। বামুনের ঘাড় এমনিতেই শক্ত। সহজে নুইতে চায় না।

অতীশ ক্রমশ বুঝতে পারছে ব্রাহ্মণত্ব আর বজায় রাখা যাচ্ছে না। বাবা মেলা বামনাই শিখিয়েছিল তাকে। যজমানি বামুন বলে কথা। কিন্তু সে সব যেতে বসেছে পেটের দায়ে।

বস্তাটা প্রথমে হাঁটুর চাড়ে পেট বরাবর, তারপর দুহাতের ঝাঁকিতে মাথায় তুলতেই ভারী টালমাটাল খেয়ে যায় অতীশ। ঘাড়ে মচাক করে একটা শব্দ হল নাকি? সরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল।

পরান অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তার বোঝাটি মাথায় তুলে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে। বলল, মাঝবরাবর হয়নি, ডানধারে কেতরে আছে। একটা ঝাঁকি মেরে একটু বাঁয়ে নিন। নইলে কষ্ট হবে।

ব্যালান্স রাখাই কষ্ট। বস্তাটায় ঝাঁকি মেরে মাঝবরাবর করার চেষ্টা করল সে। বিড়ে নেয়নি বলে মাথায় বেগুনের বোঁটা খোঁচা মারছে। বিড়েটা নিল না লজ্জায়। প্রেস্টিজে লেগেছিল। মাথায় বিড়ে নেয় তো কুলিরা। সে কেন নেবে?

পরান বলেছিল, বিড়ে না নিলে মাথায় চোট হয়ে যেতে পারে।

কুঁচকির কষ্টের সঙ্গে ঘাড়ের কষ্টটাও যোগ হল। পরান আগে হাঁটছে এবার, পিছনে অতীশ। অনেক কিছু পারতে হবে তাকে এখন। অনেক কষ্ট সইতে হবে। মানুষ সব পারে। কত শক্ত শক্ত কাজ করছে। স্টেশনের কুলিরা এর তিন ডবল মাল টানে অহরহ।

কুঁচকিটা এবার যাবে। ডান হাঁটু মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ছে ব্যথায়।

যদি সুবল মহাজন ঠিকঠাক দাম দেয় তবে মায়ের হাতে গোটা চল্লিশেক টাকা দিতে পারবে আজ। পঁচিশ কেজির মাল থেকে যদি ছাপ্পান্ন টাকা চার আনা লাভ হয় তবে খরচ খরচা বাদ দিয়ে ওরকমই থাকবে। কিন্তু ঠিকঠাক কত থাকবে তা বলা কঠিন।

বা ধারের মাঠে নামতে হবে। সাবধানে নামবেন, জায়গাটা বড্ড গড়ানে। পিছলও আছে।

দুর্গমগিরি কান্তার মরু নয়, তবু তার মধ্যেই যে কত ফাঁদ পাতা দেখে অবাক হতে হয়। উঁচু পথ থেকে মাঠে নামবার জায়গাটা এমন খাড়াই যে, দেখলে ভয় করে। সরু একটা আঁকাবাঁকা নালার মতো। হাল্কা পায়ে নামা কঠিন নয়। কিন্তু বেজুত কুঁচকি, টনটনে ঘাড় আর বেগুনের বোঝা নিয়ে নামা আর এক কথা। আজ যেন সবটাই তার কাছে শক্ত লাগছে।

পরান নেমে গিয়ে দাঁড়াল। পিছু ফিরে দেখছে তাকে। কী দেখছে? ফুল প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা ভদ্রলোকের ছেলেটা ছোটলোক হওয়ার কী প্রাণপাত চেষ্টা করছে দেখ। এ কোনওদিন ভদ্রলোকও হবে না, ভাল করে ছোটলোকও হতে পারবে না।

জন্মাবধি অতীশ ধার্মিক ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। পুজোপাঠ ইত্যাদির মধ্যেই তার জন্ম। বাবার সঙ্গে সঙ্গে সে ছেলেবেলা থেকে পুরুতের কাজে পাকা হয়েছে। ওই ঈশ্বরবিশ্বাস আজও মাঝে মাঝে তার কাজে লাগে। এই যেমন এখন। সে ওই বিচ্ছিরি নালার মতো সর্পিল পথটা দিয়ে নেমে পড়ার আগে চোখ বুজে একবার ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করে নিল।

জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করতে হয় অন্ধের মতো। বুদ্ধি বিবেচনা আত্মশক্তি তখন কোনও কাজেই লাগে না। তখন ওই বিশ্বাসটার দরকার হয়। কিন্তু জীবনে যত ঘসটানি খাচ্ছে অতীশ তত যেন বিশ্বাসটার রং চটে যাচ্ছে।

বেগুনের বস্তার ঠেলায় আর মাধ্যাকর্ষণের টানে নামাটা হল হড়হড় করে। টাল রাখা কঠিন। কুঁচকির সঙ্গে ডান হাঁটুও সঙ্গতে নেমে পড়েছে। ব্যথাটা আর এক জায়গায় নেই, গোটা পা-ই যেন গিলে ফেলছে ব্যগার কুমির।

তবু পড়ল না অতীশ। দৈব আর পুরুষকার দুটোই বোধ হয় খানিক খানিক কাজ করল। মাঠে নেমে পড়ার পর সে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে বলল, চল।

পরান আর কথা বাড়াল না। সামনে সামনে হাঁটতে লাগল। গত কালের বৃষ্টিতে ক্ষেতে কাদা জমে আছে। আলপথও খুব নিরাপদ নয়। তবে ক্ষেতের চেয়ে শুকনো।

আগে পরান পিছনে অতীশ। চলেছে। তেপান্তরের মাঠ ফুরোচ্ছে না। বোধ হয় ফুরোবেও না ইহজীবনে। পরান এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে অতীশ। তার ডান পা আর যেতে রাজি নয়। টাটিয়ে উঠছে। ফুলে উঠছে কুঁচকি। ভাবনাচিন্তা ছেড়ে দিয়েছে অতীশ। চলছে একটা ঘোরের মধ্যে। শরীর নয়, একটা ইচ্ছাশক্তি আর অহংবোধই চালিয়ে নিচ্ছে তাকে।

শিখার গাড়ি যখন তার রিক্সাকে পিছন থেকে এসে মারল তখন ছিটকে পড়েছিল অতীশ। সেই পড়ে যাওয়াটা খুব মনে আছে তার। রিক্সা চালাচ্ছে নিশ্চিন্তমনে, আচমকা একটা পেল্লায় ধাক্কায় খানিকটা ওপরে উঠে গদাম করে পড়ে যাচ্ছিল সে, তার সঙ্গে রিটাও খানিক লাফিয়ে উঠল, তারপর পড়ল তার ওপরেই। তখন কিছুই করার ছিল না অতীশের। হাত পা বোধ বুদ্ধি সব যেন অকেজো হয়ে গেল। তখন সে যেন এই বেগুনের বস্তাটার মতোই এক জড় পদার্থ। ভাগ্যের মার যখন আসে তখন মানুষের কি কিছু করার থাকে? ডান কনুই, মাথা, কোমর কেটে ছড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যতটা হওয়ার কথা ততটা হয়নি।

কথাটা হল, এক একটা সময়ে মানুষের কিছুই করার থাকে না। শত বুদ্ধিমান, বিদ্বান, কেওকেটা মানুষও তখন গাড়ল-বুন্ধু-ভ্যাবাচ্যাকা।

শিখা নেমে এল গাড়ি থেকে। একটু অপ্রস্তুত। তবু বলতে ছাড়ল না, হর্ন দিয়েছি, শুনতে পাওনি?

তা শুনেছিল হয়তো। চালপট্টিতে হর্নের অভাব কী? থিক থিক করছে রিক্সা, টেম্পো, লরি। কোন হর্নটা শুনবে সে? জবাবটা মুখে এল না, মাথাটা বড্ড গোলমাল ঠেকছিল তখন। লোক জমেছিল মেলা। দুচারজন অতীশের পক্ষ নিলেও বেশির ভাগই অতুলবাবুর মেয়ের দিকে। হর্ন দেওয়া হয়েছিল, সুতরাং দোষ কী?

অতীশ ভাবে, গাড়িতে যেমন হর্ন থাকে, তেমনি ব্রেকও তো থাকে! একটায় কাজ না হলে আর একটা দিয়ে লোককে বাঁচানো যায়। মেয়েটা আনাড়ি ড্রাইভার, সে কথা কে শুনবে? ভাঙা রিক্সা যখন টেনে তুলছে অতীশ, তখন অতুলবাবুর মেয়ে গাড়িতে ফের স্টার্ট দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল।

ঘটনাটা বড্ড মনে আছে তার। ভোলা যাচ্ছে না। মনোজবাবু রাগ করে রিয়া কেড়ে নিলেন। সেই থেকে একরকম ঘর-বসা অবস্থা তার।

তেপান্তরের মাঠ পেরোচ্ছে দুজন। সামনে শুধু ধুধু ন্যাড়া ক্ষেত। সামনে আরও এগিয়ে গেছে। পরান। দূরত্বটা কি বেড়ে যাচ্ছে? হেরে যাচ্ছে নাকি সে? জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়ছে? কিন্তু তা হলে তার চলবে কী করে? খুঁড়িয়ে, লেংচে, হিঁচড়ে তাকে বজায় রাখতে হবে গতি।

বড্ড ঘাম হচ্ছে তার। শরৎকাল শেষ হয়ে এল। তেমন গরম কিছু নেই। পরানচন্দ্রেরও তেমন। ঘাম হচ্ছে না। মাঠের ওপর দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। তবু এত ঘামছে কেন সে?

দূরে ওই কি রেলবাঁধ দেখা যাচ্ছে? খেলনাবাড়ির মতো স্টেশন কি ওই ঝোপজঙ্গলে ঢাকা? পরানচন্দ্র এবার দাঁড়াল। তারপর ফিরল তার দিকে।

কেমন বুঝছেন?

ভাল। তুমি এগোও।

ডান কনুইয়ের কাছ বরাবর একটু শিরশির করছিল। আড়চোখে চেয়ে দেখল, একটা খুঁয়োপোকা বাইছে। বাঁ হাতের আঙুলে শুয়োটাকে চেঁছে ফেলে দিল সে। এবার চুলকুনি শুরু হবে। না, আর পারা যায় না যে!

তবু পেরেও যায় মানুষ। কামড়ে থাকলে মানুষ না পারে কী? অতীশও পারল। তবে কিনা যখন রেলবাধে উঠে স্টেশনের চত্বরে এসে বস্তাখানা নামাল তখন তার মাথাটা একদম ডোম্বল হয়ে গেছে, ঠিক যেমন শিখার গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে হয়েছিল সেদিন।

পরান প্ল্যাটফর্মের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বিড়ি ধরাচ্ছিল। বলল, এলেন তা হলে?

অতীশ জবাব দিল না। ডান পাটা সামনে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে থেবড়ে বসে গেল পরানের পাশে।

জল খাবেন তত বাইরের টিপলে খেয়ে আসুন। এখনও সময় আছে।

জলের কথায় সচকিত হল অতীশ। তাই তো! তার যে বুক পেট সব তেষ্টায় শুকিয়ে আছে! শরীরের নানা অস্বস্তির মধ্যে তেষ্টাটা আলাদা করে চিনতে পারছিল না এতক্ষণ।

সে উঠল। বড় কষ্ট উঠতে। দাঁড়াতে গেলেই ডান পাটা বেইমানি করে যাচ্ছে। নেংচে খুঁড়িয়ে সে স্টেশনের বাইরে এসে টিউবওয়েলটা দেখতে পেল। যখন জল খাচ্ছিল তখন কলকল শব্দ করে পেটের মধ্যে খোঁদলে জল নেমে যাওয়ার শব্দ পেল। বড় খালি ছিল পেটটা।

জল খেয়ে ফিরে এসে দেখে পরান দার্শনিকের মতো মুখ করে চুপচাপ বসে আছে। বিড়িটা শেষ হয়েছে।

আপনার কথাই ভাবছিলাম।

অতীশ একটু হাসল, কী ভাবলে?

ভাবছিলাম, আপনি মেলা কষ্ট করছেন। এতে মজুরি পোষাবে না। আমাদের পুষিয়ে যায় কেন জানেন? আমরা এইসবের মধ্যেই জন্মেছি। শরীর যে খাটাতে হবে তা জন্ম থেকেই জানি। আপনার তো তা নয়। কোথায় ভদ্রলোকের ছেলে চাকরিবাকরি করবেন, তা নয়, এই উবৃত্তি।

অতীশ ঠ্যাংটার কথা ভাবছিল। ডান পা গুরুত্ব কমের বেচাল। এই স্থায় শালাকে লাই দিলে মাথায় উঠবে। কিন্তু শাসনেই বা রাখা যায় কী করে তা বুঝতে পারছে না।

আপনার পায়ে হয়েছেটা কী?

অতীশ অবহেলার ভাব করে ঠোঁট উল্টে বলল, দৌড়াতে গিয়ে টান লেগেছে। ঠিক হয়ে যাবে।

পরান উঠে পড়ল। বস্তাটা দাঁড় করিয়ে বলল, উঠুন। গাড়ি আসছে।

সন্ধের মুখে নিজেদের স্টেশনে নেমেই অতীশ বুঝতে পারল, একটা কিছু পাকিয়েছে। স্টেশন চত্বরটা বড় থমথমে।

কী হল পরান?

কিছু একটা হবে। দোকানপাট বন্ধ মনে হচ্ছে।

বাইরে একটাও রিক্সা নেই। এ সময়ে মেলা রিক্সা থাকার কথা। রিক্সা থাকলে অতীশের সুবিধে হত। তার পয়সা লাগত না। এ শহরের অধিকাংশ রিক্সাওলাই তার বন্ধু।

একটু দমে গেল সে। ফের বস্তা মাথায় নিয়ে বাজার অবধি ল্যাংচাতে হবে।

পুলিশের গাড়ি গেল, দেখলেন?

দেখলাম।

বাবু আর ল্যাংড়ার মধ্যে লেগে গেল নাকি?

তা লাগতে পারে। চলো।

বাজারে মালটা গস্ত করা গেল না। বাজার বন্ধ। বাবু আর ল্যাংড়ার দলে বোমাবাজি হয়েছে। ছোরাছুরি চলেছে, পাইপগান আর রিভলভারও বেরিয়েছিল। সব দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাপারিরা। একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে।

এ সবই বাজারে এসে শোনা গেল। কয়েকজন বাজারের চত্বরে কুপি জ্বালিয়ে বসে তাস খেলছিল। তারাই বলল।

ভাগ্য ভাল যে বেগুনের বস্তাটা বাড়ি অবধি টেনে নিতে হল না। বাজারের চৌকিদারকে বলে মহাজনের দোকানের সামনে রেখে বাড়ি ফিরল অতীশ। টাকাটা আজ পেলে ভাল হত।

বাড়ির পিছন দিকটায় তাদের পাড়া। ল্যাংড়ার ঠেক। বড় রাস্তা থেকে বড় বাড়ির মস্ত নিরেট দেওয়াল ঘেঁসে সরু গলি দিয়ে ঢুকতে হয়। গলির এক পাশে বড় বাড়ির দেওয়াল, অন্য পাশে গরিবগুর্বোদের খোলার ঘর। কুলিকামিন, ঠেলাওয়ালা রিক্সাওলাদের বস।

অন্যান্য দিনের তুলনায় পাড়াটা আজ অন্ধকার আর নিঃঝুম। মানুষ ভয় পেয়েছে। আজকাল মানুষ সহজেই ভয় পায়। ঠ্যাং টেনে টেনে হাঁটছে অতীশ। ব্যথা বাড়ছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু যেই একটায় ব্যথা বা চোট হল তখনই সেটা যেন জানান দিতে থাকে। এই এখন যেমন ব্যথা-বেদনার ভিতর দিয়ে তার ডান পা জানান দিচ্ছে, ওহে, আমি তোমার ডান পা! বুঝলে? আমি তোমার ডান পা! খুব তে ভুলে থাকো আমায়, এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ তো!

অতীশ বিড়বিড় করে, পাচ্ছি বাবা, খুব পাচ্ছি। এখন বাড়ি অবধি কোনওক্রমে বয়ে দাও আমাকে। তারপর জিরেন।

কথাটা মিথ্যে। কারণ আগামী কাল প্রগতি সংঘের স্পোর্টস। বরাবর ওরা ভাল প্রাইজ দেয়! এবারও ভি আই পি সুটকেস, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, হাতঘড়ি, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি প্রাইজ আছে। বিধান ভৌমিকের চিট ফান্ডের কাঁচা পয়সা প্রগতি সংঘের ভোল পাল্টে দিয়েছে। বিধান এবার সেক্রেটারি। তা ছাড়া বাবু মল্লিক আছে। গত বছর যে বিরাট ফাংশন করেছিল তাতে বোম্বে থেকে ফিল্ম আর্টিস্ট আর গায়ক-গায়িকাদের উড়িয়ে এনেছিল। অনেক টাকার কামাই। সেইসব টাকার একটা অংশ প্রগতি সংঘের পিছনে কাজ করছে। প্রগতি সংঘ এখন শুধু এই শহর বা মহকুমা নয়, গোটা জেলারই সবচেয়ে বড় ক্লাব।

অতীশের প্রাইজ দরকার। স্কুল কলেজে যত প্রাইজ সে পেয়েছে তার প্রায় সবই বেচে দিতে পেরেছে সে। কাপ-মেডেলগুলো তেমন বিক্রি হয় না, হলেও খুব নামমাত্র দামে। তবে অন্য সব জিনিস বেচলে কিছু পয়সা আসে। আজ রাতে পায়ে একটু সেকতাপ দিতে হবে। একটু মালিশ লাগাবে। সকালে একটু প্রাকটিস। তারপর দুপুরেই নামতে হবে ট্র্যাকে। সে এ তল্লাটের নামকরা দৌড়বাজ, সে পুরুত, সে একজন কায়িক শ্রমিক এবং একজন কমার্স গ্র্যাজুয়েট। তবু নিজেকে তার একটা বিস্ময়ের বস্তু মনে হয় না। মনে হয়, এরকম হতেই পারে।

এই ফিরলে গুরু? বলে অন্ধকারে একটা ছোকরা একটু গা ঘেঁসে এল।

নির্বিকার অতীশ বলল, হ্যাঁ।

খুব ঝাড়পিট হয়ে গেল আজ। রাস্তায় পুলিশ দেখলে না?

হ্যাঁ।

সাত আটজনকে তুলে নিয়ে গেছে। ল্যাংড়া হাপিস।

ও।

ল্যাংচাচ্ছ কেন? কী হয়েছে?

ও কিছু নয়। একটু টান লেগেছে শিরায়।

ছেলেটা বিশু। বন্ধুমতো, একটু চামচাগিরিও করে তার। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, বাবু ঠিক এন্ট্রি নিয়ে নেবে, বুঝলে? আজ বড় বাড়ির অন্দরের গেট অবধি এসে গিয়েছিল। বহুত বোমাবাজি হয়েছে। ল্যাংড়া শেষ অবধি চাল বেয়ে বেয়ে দক্ষিণের খাবারে নেমে পালিয়ে যায়।

এসব অতীশকে স্পর্শ করে না। এসব যেন অন্য জগতের খবর। ওই জগতের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। তার জগৎ খুব ছো, সংকীর্ণ এই গলিটার মতোই। সে জানে অনেক ব্যথা বেদনা বাধা সয়ে তাকে গতি বজায় রাখতে হবে। আজ রাতে ব্যথাটা যদি কমে ভাল, নইলে কাল এই বিষব্যথা নিয়েই তাকে দৌড়ে নামতে হবে। হাততালি নয়, জয়ধ্বনি নয়। তাকে একটা দামি প্রাইজ পেতেই হবে। সকালে আদায় করতে হবে বেগুনের টাকা। তার অনেক কাজ। বাবু আর ল্যাংড়ার কাজিয়ায় তার কোনও কৌতূহল নেই।

তবে ল্যাংড়া ইস্কুলে অতীশের সঙ্গে এক্লাসে পড়ত। ভীষণ ভাব ছিল দুজনে। প্রায় সময়েই গলাগলি করে ফিরত। একসঙ্গে খেলে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায়। একটা তফাত

ছিল। রেগে গেলে ল্যাংড়া খারাপ গালাগাল দিত লোককে। অতীশের মুখে খারাপ কথা আসত না। দিনরাত পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি শুনে আসছে অতীশ জন্মাবধি। আজ অবধি শালা কথাটাও উচ্চারণ করতে তার সংকোচ হয়। ল্যাংড়া জলের মতো ওসব বলত। সিক্সে দুবার ফেল করে পড়া ছেড়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে তার অন্য লাইনে উত্থান হতে লাগল। তখন কালো গুণ্ডার যুগ। চোলাই আর জুয়ার ঠেক তত ছিলই তার। এইসব বস্তিতে যে সব ছোটখাটো মেশিনপত্র নিয়ে নানা ব্যবসা করে লোক তাদের কাছ থেকে তোলা নিত। বড় কালীপুজো করত, যেমন গুণ্ডারা করেই থাকে। ল্যাংড়া কিছুদিন কালোর সাকরেদি করেছিল। কিন্তু বড় হওয়ার ইচ্ছে তার বরাবর। কী কারণে কে জানে, কালোর সাকরে পল্টুকে টিউবওয়েলের ধারে এক রাতে খুন করল ল্যাংড়া। তুচ্ছ কারণই হবে। হয়তো খুনটা ছিল আত্মপ্রকাশের ঘোষণা। দিন তিনেক দু পক্ষের বিচ্ছিন্ন মারপিট চলল। তারপর কালো বেগতিক বুঝে পাড়া ছেড়ে পালাল। ল্যাংড়া লিডার হয়ে গেল। কালো ছমাস বাদে এল। মস্তানি করতে নয়, বোধহয় পেটের তাগিদে। আর বউ বাচ্চার টানে। ল্যাংড়া ভরসন্ধেবেলা ল্যাম্পপোস্টের নীচে তার গলায় ড্যাগার ঠেকিয়ে কথা আদায় করল। নিজের লেদ মেশিন আর কেরোসিনের দোকান ছাড়া অন্য কিছুতে মাথা গলাতে পারবে না। কালো রাজি হয়ে গেল।

এসব ঘটনায় অবশ্য কোনও অভিনবত্ব নেই। গুণ্ডাদের উত্থান পতন এভাবেই সর্বত্র হয়ে থাকে। হয়ত এতটা শান্তিপূর্ণভাবে নয়, হয়তো দু-চারটে খুনজখম হয়। ল্যাংড়া শুধু পাড়াই দখল করেনি, সে এখন শহরটাই দখল করতে চাইছে। হয়ে উঠতে চাইছে হিরো। খানিকটা হয়েছে। নইলে অপরূপা দিদিমণির মতো এম এ বিটি সুন্দরী মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে?

গতবছর বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় খুব ঝামেলা হয়েছিল। প্রতিবারই হয়। মেয়েরা পরীক্ষায় বসলেই তাদের যত ভক্ত প্রেমিক, হবু প্রেমিক তাদের সাহায্য করতে এসে জোটে। প্রেমিকাদের ইমপ্রেস করতে অনেক দুঃসাহসী কাণ্ডও করে তারা। দেয়াল টপকে লাইন বেয়ে উঠে নকল সাপ্লাই, খাতা বাইরে এনে প্রশ্নের উত্তর

লিখে ফের দিয়ে আসা ইত্যাদি। স্কুল কর্তৃপক্ষ জ্বালাতন হয়ে শেষে শান্তিরক্ষার জন্য ল্যাংড়াকে ডেকে এনেছিল। ল্যাংড়ার বীরত্ব, চেহারা এবং হয়তো আরও কিছু অপরূপা দিদিমণিকে একেবারে বিহ্বল করে ফেলল। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সের অপরূপা ল্যাংড়ার চেয়ে বছর তিন চারের বড়। ভাল ঘরের মেয়ে। বাবা সরকারি অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার্ড, দাদা বাইরে কোথায় যেন প্রফেসর। শোনা যাচ্ছে, অপরূপা আজকাল ল্যাংড়াকে পড়াচ্ছে, সৎপথে আনার চেষ্টা করছে। বিয়েও খুব শিগগিরই।

এসব ঘটে যায় সিনেমার ছবির মতো। অতীশের কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। চারপাশে কত কী ঘটে যাচ্ছে, সেসবের মাঝখান দিয়ে তার জীবনটা চলেছে ঠিক যেন একটা সরু গলির মতো।

বিশু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আজ দিদিমণি বাবুকে খুব রগড়ে দিয়েছে, বুঝলে?

তাই নাকি?

বোমবাজির আগে বাবু যখন বড় রাস্তায় পজিশন নিচ্ছিল তখন অপরূপা দিদিমণি রিক্সা করে এসে নামল। তখনই লেগে গেল। বাবু নাকি বলেছিল আপনি একজন শিক্ষিতা ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে ওরকম একটা নোংরা অশিক্ষিত গুণ্ডার সঙ্গে কী করে মেলামেশা করেন। দিদিমণি বহুত বিগড়ে গিয়ে চিল্লামিল্লি করতে লাগল, আপনি না মার্কসিস্ট! শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলে বেড়ান! কোন লজ্জায় বলেন?

প্রেমট্রেম নিয়ে মাথা ঘামায় না অতীশ। তবে তার মনে হল, প্রেম ব্যাপারটা হয়তো এরকমই।

বিশু বলল, অপরূপা দিদিমণি মেয়েছেলে না হয়ে পুরুষ হলে বহুত বড়া রুস্তম হত, বুঝলে গুরু? ল্যাংড়া লাগত না ওর কাছে। যখন বোমবাজি শুরু হল তখনও বেঁটে ছাতা নিয়ে বাবুকে তেড়ে মারতে যাচ্ছিল। তারপর কী করেছে জানো? থানায় গিয়ে বড়বাবুকে পর্যন্ত আখ দেখিয়েছে। বলেছে, বাবুর এগেনস্টে যদি কেস না লেখেন তো আমি চিফ

মিনিস্টার আর প্রাইম মিনিস্টারকে জানাব। তারপরই তো পুলিশ নামল। নইলে ল্যাংড়ার যা অবস্থা করেছিল একদম কেরাসিন। বাবু আজই পাড়া দখল করে নিত।

পাড়া কে দখল করল না করল তাতেও অতীশের কিছু যায় আসে না। বাবুদা লেখাপড়া জান, ভদ্র ছেলে। এ পাড়ায় ঘর নিয়ে সে একসময়ে মার্কসবাদের ক্লাস নিত। তখন অতীশও তার ক্লাসে নিয়মিত গেছে। অনেক নতুন কথা শিখিয়েছিল বাবুদা। অধিকাংশই অবশ্য অতীশের এখন মনে নেই। শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, যৌথ খামার, শ্রমিক আর কৃষকের অধিকার ইত্যাদি। পরে পার্টির গুরুতর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মার্কসবাদের পাঠশালাটা উঠে যায়। সে পুরুতের ছেলে এবং পুজো আচ্চা করে বেড়ায় বলে বাবুদা কখনও টিটকিরি দেয়নি। বরং খুব আন্তরিকভাবেই বলত, পুজো করছ? ভাল করে করো। ওর মধ্যে কিছু আছে কি না খুঁজে দেখো ভাল করে। আমার কী মনে হয় জানো? ভগবানের চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হল সমাজে নিজের স্থানটা আবিষ্কার করা।

নিজের স্থানটা আজও আবিষ্কার করতে পারেনি অতীশ যখন রিক্সা চালায় তখন ভাড়া নিয়ে কত হেটোমেটো লোকও কত অপমান করে, মারতে আসে, গাল দেয়। আবার যখন কোনও বাড়িতে পুজো করতে যায়, তখন কত বুড়িধুড়িও মাটিতে পড়ে পায়ের ধুলো নেয়। সবজির পাইকার তাকে জিনিসের ন্যায্য দাম দিতে গড়িমসি করে, আবার ভিক্টরি স্ট্যান্ডে যখন দাঁড়ায় তখন কত হাততালি পায় সে। সুতরাং এ সমাজে তার স্থানটা কোথায় তা স্থির করবে কী করে সে?

বিশু বলল, বাবু হুজ্জুতটা কেন করছে জানো?

না। কেন?

কিছুদিন আগে সুবিমল স্যার ল্যাংড়াকে ডেকে পাঠিয়ে বলে, তুই পার্টিতে চলে আয়, তা হলে পার্টি তোকে দেখবে। ল্যাংড়া মুখের ওপর না বলতে পারেনি। কিন্তু পরে বলে

পাঠিয়েছে পার্টিতে যাবে না। স্বাধীনভাবে থাকবে। শালা বুদ্ধ আছে। পাটির সঙ্গে লাগলে উড়ে যাবে একদিন। আজ পালিয়ে বেঁচে গেছে, কিন্তু রোজ তো আর লাক ফেবার করবে না, কী বলো গুরু? বাবু ওকে ঠিক একদিন ফুটিয়ে দেবে। পার্টিতে গেলে দোতলা বাড়ি আর মোটরবাইক দুটোই হয়ে যেত।

ল্যাংড়ার আপাতত দুটো স্বপ্ন। একটা দোতলা বাড়ি করবে, আর একটা হোন্ডা মোটরবাইক কিনবে। পাড়ার সবাই সে কথা জানে। তার মানে এ নয় যে, এ দুটো হলেই ল্যাংড়া ভাল ছেলে হয়ে যাবে। তা নয়। আপাতত এ দুটো স্বপ্ন দেখছে, পরে আরও স্বপ্নের আমদানি হবে। অতীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই বেকারির যুগে মস্তানিও একটা ভাল প্রফেশন। ল্যাংড়াকে আর চাকরির ভাবনা ভাবতে হয় না, ভাত রুটির চিন্তা নেই।

খড়কাটা কলের পাশেই মদন দাসের খুপরির সামনে মাতাল মদনকে পেটাচ্ছিল তার লায়েক ছেলে পানু। পেটানোটা যেন জুতমত হয় তার জন্য মদনের বউ নবীনা আর মেয়ে সুমনা তার দুটো হাত দুদিকে দিয়ে চেপে ধরে আছে। পিছন থেকে কোমর ধরে আছে ছেলে নয়ন। মদনের মুখ থেকে যেসব গালাগাল বেরোচ্ছে তার চেয়ে খারাপ কথা পৃথিবীতে আর অল্পই আছে। আগে মদনই মাতাল হয়ে ফিরে বাড়িসুদ্ধ লোককে পেটাত আর গাল দিত। আজকাল চাকা ঘুরে গেছে। ব্যাপারটা অতীশের খারাপ লাগে না। এ যেন অতীতের দেনা শোধ হচ্ছে। বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে গেছে দৃশ্য দেখতে। চোখ ভিডিও ক্যামেরা কাম টেপ রেকডার। হাবিব তনবীরের নাটক পয়সা খরচা করে দেখতে যাওয়ার দরকার কি?

বিশু এখানেই কেটে গেল। অতীশ দাঁড়াল না। এগোতে লাগল। এই যে হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু এক একটা যখন বিগড়োয় তখন সেটাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুতর ভি আই পি। কুঁচকির সঙ্গে একটা সাইকোলজিক্যাল যুদ্ধে নামার চেষ্টা করছে অতীশ। হচ্ছে না। রবি ঠাকুরকে একবার কাঁকড়া বিছে কামড়েছিল। সেই অসহ্য ব্যথা ভুলবার জন্য রবি ঠাকুর শরীর থেকে মনকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। ফলে আর ব্যথা টেরই পেলেন না। মনকে শক্ত করতে পারলে

হয়তো হয়। অতীশ মনে মনে জপ করতে লাগল, এটা আমার কুঁচকি নয়, এটা আমার কুঁচকি নয়...

একটু কমপ্রেস আর গরম চুন-হলুদ দিয়ে রাখবে আজ রাতে। দরকার হলে কাল স্পোর্টসের আগে একটাব্যথার ইনজেকশন নিয়ে নেবে। তারপর ব্যথা দুনিয়ে যদি বিছানায় পড়ে থাকতে হয় লেভি আয়।

বাড়ি ফেরা কথাটাই ক্রমে অর্থহীন হয়ে আসছে অতীশের জীবনে। বাড়ি একটা ঠেক মাত্র। অনেকটা রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মতো। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার জন্য গাড়ি বদল করা মাত্র। তাদের একখানা মাত্র ঘর, সাতটি প্রাণী, একটা চৌকি আছে, তাতে বাবা শোয়। আর বাদবাকি মেঝেতে মাদুর পেতে। তাতেও জায়গা হয় না। অতীশ রাতে শুতে যায় ইস্কুলবাড়ির বারান্দায়। তাদের কলঘর নেই, বারোয়ারি পায়খানা, স্নানের জন্য দূরের পুকুর অথবা রাস্তার কল। তবু বাড়ি ফেরার একটা নিয়ম চালু আছে। জানান দিয়ে যাওয়া যে, আমি আছি।

মেঝেতে মাদুরের ওপর উপুড় করা একটা কৌটোর মাথায় হারিকেন বসানো। সেই আলোয় গ বসিয়েছে পাঁচ জন, বড়দি কুরুশ কাঠিতে অডারি লেস বুনছে, ছোড়দি একটা সোয়েটারে ভিজাইন তুলছে, দুই ভাইবোন পড়ছে, মা চাল বাছছে, বাবা বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে শোওয়া।

তাকে দেখে মা একটা শাস ফেলল। বোধহয় অনেকক্ষণ ওই উদ্বেগের স্বাসটি বুকে চেপে রেখেছিল।

কোথায় ছিলি?

গাঁয়ে গিয়েছিলাম।

বড় বাড়ি থেকে বাহাদুর এই নিয়ে তিনবার এল খোঁজ করতে।

কী ব্যাপারে?

বন্দনার অসুখ সেরেছে, আজ তাই নারায়ণপুজো। কর্তামা সকাল থেকে উপোস। তোর বাবার জ্বর, যেতে পারছে না। তাড়াতাড়ি যা।

মেদুর শব্দটার অর্থ খুব ভাল করে জানে না অতীশ। তবে তার বুকের ভিতরটা যেন মেদুর হয়ে গেল। একটা খাঁ খাঁ মরুভূমির মতো শুখা প্রান্তরে এ বুঝি মেঘের ছায়া, দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিপাত। দ্বিরুক্তি না করে সে হাতমুখ ধুয়ে পুজোর কাপড় পরে নামাবলী চাপিয়ে নারায়ণশিলা নিয়ে রওনা হল।

বড় বাড়িতে আসতে হলে আগে বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে দেউড়ি দিয়ে ঢুকতে হত। আজকাল পিছনের ঘের-পাঁচিলের ভাঙা অংশটা দিয়েই ঢোকা যায়। আর কলেই অন্য জগৎ। স্বপ্নের মাখামাখি। উষর মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের মতোই কি? চারদিককার ক্ষিঃ ক্ষুব্ধ, দরিদ্র পটভূমিতে এ এক দূরের জগৎ। দোতলার ঘরে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা জাপানি পুতুলের সারি যেমন অবাক চোখে দেখত অতীশ, এ যেন সেরকমই কিছু। এখানে যেন ধুলো ঢোকে না, ময়লা ঢোকে না, নোংরা কথা ঢোকে না, মতবাদ ঢোকে না। বড় বাড়ি যেন এখনও কাঁচের আড়ালে জাপানি পুতুল।

তা অবশ্য নয়। বড় বাড়ি ভাঙছে। অবস্থা পড়ে যাচ্ছে। সবই জানে অতীশ। তবু আজও বড় বাড়িতে এলে তার বুকের ভিতরটা মেদুর হয়ে যায়। মন নরম হয়ে আসে।

কুল-পুরোহিত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার পর মেঘনাদ চৌধুরির বাবা হরিদেব চৌধুরি অতীশের বাবা রাখাল ভট্টাচার্যকে সামান্য মাসোহারায় পুরোহিত নিযুক্ত করেন। রাখাল ভট্টাচার্য অন্য দিকে তেমন কাজের লোক নন, কিন্তু পুজোপাঠ ভালই জানতেন। বাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন জগদ্ধাত্রী। রোজ রাখাল ভট্টাচার্য পূজো করতে আসতেন। অতীশ যখন সবে হাঁটতে শিখেছে তখন সেও বাবার সঙ্গে আসত। সেই বিস্ময়ের বুঝি তুলনা নেই। বস্তির নোংরা অপরিসর অন্ধকার ঘর থেকে যেন

রূপকথার জগতে আসা। কত বড় বাগান, কী সুন্দর সিঁড়ি, কত বড় বড় ঘর, আলমারিতে সাজানো কত জিনিস। বাবা পুজো করত আর অতীশ গুটগুট করে হেঁটে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াত।

একদিন সে ছাদে উঠে গিয়েছিল একা। উঠেই সে বিস্ময়ে স্তব্ধ। কত বড় আকাশটা! অথচ কত কাছে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তখন বিকেল। সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় চারদিক যে কী অপরূপ হয়েছিল সেদিন।

হরিদেব চৌধুরি সন্ধের পর ছাদে গিয়ে বসতেন। তাঁর জন্য একটা ডেক-চেয়ার পাতা ছিল ছাদে। অতীশ একসময়ে সেই বিশাল ডেকচেয়ারে উঠে বসল। তারপর আকাশ দেখতে দেখতে গভীর ঘুম। তাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল সেদিন। তাকে খুঁজে বের করেছিল প্রদীপদা। সেই থেকে প্রদীপদার সঙ্গে ভাব। যেখানেই প্রদীপদা সেখানেই সে। প্রদীপদা বাঁখারি দিয়ে ধনুক বানাত, পেয়ারার ডাল কেটে বানাত গুলতি, ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিত। সব কাজে সাহায্যকারী ছিল সে। প্রদীপদা যখন পার্টি করতে গেল তখনও সে ছিল সঙ্গে।

বাবুদা একবার তাকে বুঝিয়েছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা এত সূক্ষ্ম আর এত চালাকিতে ভরা যে তা বুঝে ওঠাই কঠিন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওই সম্পর্কই ধ্বংস করে দিতে থাকে মানুষের মূল্যবান মেরুদণ্ড।

কথাটা উঠেছিল একটা বিশেষ কারণে। প্রদীপদা আর বাবুদার মধ্যে পার্টিতে একটা খাড়াখাড়ি চলছিল। সুবিমল স্যার প্রদীপদাকে একটু বিশেষ পছন্দ করতেন বলেই বোধহয়। প্রদীপদা খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল না, পলিটিক্সও হয়তো ভাল বুঝত না। কিন্তু সে যা করত তা প্রাণ দিয়ে করত। একটা জানববুল ভাব ছিল। সুবিমল স্যারের পক্ষপাত বোধহয় সেই কারণেই। সেই সময়ে বাবু একদিন অতীশকে পাকড়াও করে বলেছিল, তুই কি ওর চাকর যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াস? তোর বাবা ওদের কর্মচারী হতে পারেন, তুই তো নোস।

একটু তর্ক করার চেষ্টা করেছিল অতীশ। পারেনি। বাবুদার কাছে তখন সে মার্ক্সবাদের পাঠ নেয়, পারবে কেন? মুখে না পারলেও মনে মনে সে জানত, বাবুদার ব্যাখ্যাটা ভুল। তার সঙ্গে প্রদীপদার প্রভূ-ভূত্যের সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই থেকে মনে একটা ধন্ধের সঞ্চার হল অতীশের, কে জানে হয়তো বাবুদাই ঠিক বলছে। মনের গভীর অভ্যন্তরে হয়তো এখনও সামন্ত প্রভুর প্রতি আনুগত্যের ধারা রয়ে গেছে। এবং একথাও ঠিক, সে প্রদীপদার এক নম্বর আজ্ঞাবহ। বরাবর প্রদীপদা যা বলেছে তাই করে এসেছে। কেন করেছে? এই দাস্যভাব কোথা থেকে এল?

নানা মতবাদের প্রভাবে মানুষের স্থির চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। হরেক রকম ব্যাখ্যা আর অপব্যাখ্যায় তৈরি হয় কুট সন্দেহ। আর সন্দেহ ঢুকে গেলেই অনেক সহজ জিনিসও জটিল হয়ে ওঠে। কথাটা কানে ঢোকার পর থেকেই সে একটা অসহ্য অস্থিরতায় ভুগেছে। পরদিন ভোরবেলা প্র্যাকটিসের সময় সে এত জোরে দৌড়েছিল যেমনটি আর কখনও দৌড়োয়নি। বোধহয় মাইল দশেকের বেশিই হবে। পরেশ পালের ইটভাঁটি ছাড়িয়ে সেই লোহাদিঘি পর্যন্ত।

বাগানটা পার হতে আজ সময় নিল অতীশ। বুকে অনেক মেদুরতা। আতা গাছটার নীচে বসে আজকাল তিনতাস খেলে ল্যাংড়া আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। ওইখানে শিশু বন্দনা বসে পুতুল খেলত শীতের রোদে। অতীশ কতবার তার পুতুলের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়েছে। মিছে নেমন্তন্ন অবশ্য। কাঁকর দিয়ে তরকারি। পাথরকুচি পাতার লুচি। কাদামাটি দিয়ে পায়েস। একটু বড় হয়ে বন্দনা যখন গান গাইত, তবলায় ঠেকা দিতে ডাক পড়ত তার। বড় বাড়ির আলমারিতে সাজানো জাপানি পুতুলের মতোই দেখতে ছিল মেয়েটা। মুখে স্বপ্ন মাখানো। কী অবাক দৃষ্টি ছিল চোখে! তখন বালিকা বয়স, তখনও শ্রেণীচেতনা আসেনি। তখনও গরিব বলে চিনতে পারেনি অতীশকে। কর্মচারী বলে চিনতে পারেনি। তখন বায়না করত। পেনসিল এনে দাও, গ্যাস-বেলুন এনে দাও, রথ সাজিয়ে দাও, একটু বড় হয়ে যখন গরিব আর কর্মচারী বলে বুঝতে শিখল তখন ফরমাশ করত। উল

এনে দাও, ট্রেসিং পেপার নিয়ে এসো, ডলির বাড়ি থেকে নজরুলের স্বরলিপিটা এনে দিয়ে যাও। বায়না আর ফরমাশের মধ্যে তফাত হল।

প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা আর কাটিয়ে উঠতে পারল না তারা। এখনও বড় বাড়ির হুকুম হলে তারা সব করতে পারে। মেঘনাদ চৌধুরি তার শালিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাসোহারা উঠে গেছে। তবু এক অদৃশ্য নিয়মে এরা এখনও তাদের প্রভুই। এইসব সামন্ত প্রভুর স্বরূপ চিনিয়ে দিতেই তো বাবুদা মার্কসবাদের পাঠশালা খুলেছিল। অতীশ শিখেওছিল অনেক, কিন্তু তাতে কাজ বিশেষ হয়নি। আজও বড় বাড়িতে ঢুকতে ঘাড় নুয়ে পড়ে। স্মৃতি খারাপ জিনিস, শ্লথ করে দেয় মানুষকে, ব্যাহত হয় গতি, তবু বড় বাড়িতে ঢুকলেই দামাল সব স্মৃতি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাগানটা খুব আস্তে আস্তে পার হল অতীশ।

সামন্ততান্ত্রিক সিঁড়িটার গোড়ায় এসে ঊর্ধ্বমুখ হল সে। কেন যে এত উঁচু উঁচু বাড়ি বানাত সে আমলের লোকেরা! একতলা থেকে দোতলায় উঠতেই যেন হাজারটা সিঁড়ি। গুনতিতে হাজার না হলেও টাটালে কুঁচকি নিয়ে উঠতে হাজারটারই পেরানি পড়ে যাবে।

বন্দনা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়। এত রোগা, সাদা আর বিষয় হয়ে গেছে এ যেন বাস্তবের বন্দনা নয়, অনেকটাই বিমূর্ত, তাকে দেখেই বন্দনা ঝঙ্কার দিল, এতক্ষণে আসার সময় হল! মা সকাল থেকে উপোস করে বসে আছে। কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে তোমার! মা, ওমা, দেখ শাঁখ বাজাবে না উলু দেবে। তোমার পূজনীয় পুরুত ঠাকুর এসে গেছে।

বাকি সিঁড়ি কটা নিজেকে হিঁচড়ে টেনে তুলতে দম বেরিয়ে গেল অতীশের। উঠে খানিকক্ষণ হাঁফ সামলাল। কাল স্পোর্টসের মাঠে এই কুঁচকি তাকে কতটা বহন করবে কে জানে!

বড় বাড়ির পুজোর ঘরটি চমৎকার। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে বাঁধানো মেঝে, মস্ত কাঠের সিংহাসনে বিগ্রহ বসানো, সামনে পঞ্চপ্রদীপ, ধূপ। স্থলপদ্ম আর শিউলির গন্ধে ম ম করছে চারদিক। পুরুতের জন্য মস্ত পশমের আসন পাতা।

তার ভিতরে দুজন লোক ঢুকে বসে আছে। রাখাল ভট্টাচার্য আর কার্ল মার্কস। যখন মার্কসবাদের পাঠশালায় পাঠ নিত তখন থেকেই তার ভিতরে এই দুজনের ধুন্ধুমার লড়াই। কখনও এ ওকে ঠেসে ধরে, কখনও ও একে পেড়ে ফেলে। মাঝে মাঝে লড়াই এমন তুঙ্গে ওঠে যে কে কোন জন তা চেনাই যায় না। কেউ হয়তো কার্ল ভট্টাচার্য হয়ে যায়, কেউ হয়ে যায় রাখাল মার্কস। এই দুজনের পাল্লায় পড়ে সে হয়েছে একটি বকচ্ছপ। আস্তিক না নাস্তিক তা বোৰা দুস্কর।

আচমন সেরে সে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, যজ্ঞ হবে নাকি কর্তামা?

কর্তামা পাটায় চন্দন ঘষতে ঘষতে বললেন, হবে না মানে?

হবে? ডোবালে। বসতেই কুঁচকি আর এক দফা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। এই প্রবল অস্বস্তি নিয়ে কতক্ষণ টানা যায়?

এই দুর্দিনেও পাড়া ঝেটিয়ে বুড়োবুড়ি এসে জুটেছে। মস্ত ঠাকুরঘরে দেয়াল ঘেঁসে সার সার আসনে তারা বসা। সব ক জোড়া চোখ তার দিকে। পুজোয় ফাঁকি দেওয়ার জো নেই।

এই কি তোদর পুরুত নাকি রে বন্দনা? এ মা, এ তো বাচ্চা ছেলে। পারবে?

পারে তো! পুরুতেরই ছেলে।

তবু ভাই, পুরুত একটু বয়স্ক না হলে যেন মানায় না।

খুব সাবধানে মুখটা একটু ফিরিয়ে কোনাচে চোখে মেয়েটাকে একবার দেখে নিল অতীশ। শ্যামলা রং, কিন্তু মুখখানা ভারী সুশ্রী। চোখ দুটো একটু কেমন যেন। যেন এক জোড়া সাপ হঠাৎ বেরিয়ে এসে ছোবল দিল।

অতীশ উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করতে লাগল।

রাখাল ভট্টাচার্য সংস্কৃত শিখেছিলেন টোলে। উচ্চারণটি নিখুঁত। অতীশ শিখেছে রাখাল ভট্টাচার্যের কাছে। সংস্কৃত মন্ত্রের একটা গুণ হল, উচ্চারণ ঠিক হলে আর কণ্ঠস্বরে সঠিক সুরের একটা দোল লাগাতে পারলে আজও হিপ্নোটিক। শুধু গরিব কেন, বড়লোকেরও আফিং।

আফিংটা ক্রিয়া করছে নাকি? ঘরটা হঠাৎ চুপ মেরে গেল! গলাটা উঁচুতেই তুলেছে অতীশ। রাখাল ভট্টাচার্য এইরকমই শিখিয়েছে তাকে। মন্ত্র উচ্চগ্রামে পাঠ করতে হয়, তাতে বাড়ির সর্বত্র মন্ত্রের শব্দ পৌঁছয়, তাতে বায়ু পরিশ্রুত হয়, জীবাণু নাশ হয়, অমঙ্গল দূর হয়। মন্ত্রের অত শক্তি আছে কি না জানে না অতীশ। আছে কি নেই বিচার করার সে কে? তার কাজ হল করে যাওয়া। ভাল যদি কিছু হয় তো হোক।

যজ্ঞ শেষ করে শান্তিজল ছিটিয়ে অতীশ উঠল। ঘোষাল ঠাকুমা ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এসে এক গাল হেসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কী পুজোটাই করলি দাদা আজ! স্বচক্ষে দেখলুম ঠাকুর যেন নেমে এসে সিংহাসনে বসে হাসছেন।

বটে ঠাকুমা? বলে অতীশ একটু হাসল।

তোর ওপর কি আজ ভর হয়েছিল দাদা?

তা হয়তো হবে। কত কী ভর করে মাথায়।

ও দাদা, তুই বি কম পাশ এত ভাল পুরুত, ভদ্রলোকের ছেলে, তার ওপর বামুন, রিক্সা চালানোটা ছেড়ে দে না কেন দাদা! ও কি তোকে মানায়?

রিক্সা চালানোর কথা উঠলেই মুশকিল। কর্তামা নিজেও একদিন না জেনে তার রিক্সায় উঠেছিলেন। ভাড়া দেওয়ার সময় মুখের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠলেন, তুই! তুই রিক্সা চালাচ্ছিস?

শ্রমের মর্যাদার কথা এদের বুঝিয়ে লাভ নেই। এরা বুঝবেন না। তাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল অতীশ। কর্তামা রাগের চোটে কেঁদেই ফেললেন প্রায়। তুই না আমাদের পুরুত! ছিঃ ছিঃ, তোর রুচিটা কী রে?

তার এক সহপাঠিনী অনুকাও না জেনে তার রিক্সায় উঠেছিল। মাঝপথে হঠাৎ অতীশ রিক্সা চালাচ্ছে টের পেয়ে চলন্ত রিক্সা থেকে লাফিয়ে পড়ে শাড়িতে পা জড়িয়ে কুমড়ো গড়াগড়ি।

তবু তো বেগুনের বস্তার কথা এরা জানে না।

ঘোষাল ঠাকুমা তার ডান হাতখানা ধরে আছে এখনও, ওসব তোর সইবে না রে ভাই। ছেড়ে দে।

ঘোষাল ঠাকুমা তার তেরো বছরের নাতনি সুচরিতার সঙ্গে অতীশের বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। তার মায়ের কাছে প্রস্তাব গেছে। মা হেসে বলেছে, আপনার নাতনিকে আমার ছেলে খাওয়াবে কী মাসিমা? ছেলে আগে দাঁড়াক।

ঘোষাল ঠাকুমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতীশ দাঁড়াবেই।

দাঁড়াতেই চাইছে অতীশ, তার মতো আরও বহু ছেলে ছোকরাও দাঁড়াতে চাইছে। দাঁড়াতে গিয়েই যত ঠেলাঠেলি আর হুড়োহুড়ি। পলিটিক্স করে বাবুদা দাঁড়িয়ে গেল, মস্তানি করে ল্যাংড়া। অতীশ কি পারবে? যে গলিপথ সে অতিক্রম করছে তার শেষে জয়মাল্য নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, অতীশ। জানে।

কর্তামা পেতলের গামলায় সিন্নি মাখতে মাখতে মুখ তুলে বললেন, কী কাণ্ড হয়েছে জানিস? তোদের ওই ল্যাংড়া দলবল নিয়ে আমাদের বাগানের ভিতরে ঢুকে দেয়াল টপকে বাইরে বোমা মারছিল। উল্টে বাইরের ছেলেরাও ভেতরে বোমা ফেলেছে। কী কাণ্ড বাবা, ভয়ে দরজা জানালা এটে ঘরে বন্ধ হয়ে ছিলাম। গোপালটা বাগানেই থাকে। বুড়ো মানুষ, হার্টফেল হয়ে মারা যেতে পারত। মদন তাকে ভিতরবাড়িতে টেনে আনতে গিয়েছিল, এই বড় ছোরা নিয়ে মদনকে এমন তাড়া করেছে যে পালানোর পথ পায় না।

অতীশ চুপ করে রইল। এরকমই হওয়ার কথা।

কর্তামা করুণ মুখ করে বললেন, সন্ধেবেলা হীরেন দারোগা এসে কথা শুনিয়ে গেল। আমরা নাকি ষণ্ডাগুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি। ঘটনা পুলিশকে জানাচ্ছি না। আমাদের বাড়িতে নাকি বোমা মজুত রাখা হয়। আজ আমি ঠিক করে ফেলেছি, বাড়ি বিক্রি করে দেব। শাওলরাম মাড়োয়ারি কিনতে চাইছে। ছেলে মেয়ে রাজি ছিল না বলে মত দিইনি। আজ ঠিক করে ফেলেছি। এত বড় বাড়ি ঝাড়পোঁছে কষ্ট, ট্যাক্সও গুনতে হয় একগাদা। আমাদের এত বড় বাড়ির দরকার কী বল!

দেয়ালটা সারালে হয় না কর্তামা?

সে চেষ্টাও কি করিনি। মিস্ত্রি বলল, দেয়াল ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, ভাঙা জায়গায় গাঁথনি দিলে দেয়ালসুদ্ধু পড়ে যাবে। মেরামত করতে হলে চল্লিশ ফুট দেয়াল ভেঙে ফেলে নতুন করে গাঁথতে হবে। তার অনেক খরচ।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নাইলনের ব্যাগে ভরে অতীশ যখন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে তখন মেয়েটা সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়ে ডাকল, শুনুন!

অতীশ মুখ তুলে শ্যামলা মেয়েটিকে দেখতে পেল। ছিপছিপে চেহারা। চোখ দুখানা এত জিয়ন্ত যে তাকালেই একটা সমোহনের মতো ভাব হয়।

কিছু বলছেন?

আপনার সংস্কৃত উচ্চারণ কিন্তু খুব সুন্দর।

ও। তা হবে।

আপনি বোধহয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের একটু নকল করেন, তাই না?

অতীশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তা হবে।

তবু বেশ সুন্দর। আমি দীপ্তি। বন্দনার পিসতুতো দিদি।

ও। অতীশ আর তা হবে বলল না। বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল অবশ্য।

আমি খুব বিচ্ছু মেয়ে। ভাব করলে টের পেতেন। কিন্তু আপনি যা গোমড়ামুখো, ভাব বোধ হয় হবে না।

আমি বড় সামান্য মানুষ। আমার সঙ্গে ভাব করে কী হবে? ভাব হয় সমানে সমানে।

তাই বুঝি। আমি কিন্তু জমিদারবাড়ির কেউ নই। সামান্য একজন অধ্যাপকের মেয়ে। আমার অত প্রেজুডিস নেই। আপনি কি নিজেকে খুব ছোট ভাবেন?

নিজেকে যে কী ভাবে অতীশ তা কি সে নিজেই জানে! কথাটার জবাব না দিয়ে সে একটু হাসল।

আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। কিন্তু আসতে না আসতেই কী কাণ্ড! শহরটা যে একটু ঘুরে দেখব তার উপায় নেই। আপনি আমাকে শহরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন?

আমি?

নয় কেন? আমার তো আর সঙ্গী নেই। বন্দনা সবে জ্বর থেকে উঠেছে, বিলু ছেলেমানুষ, মামিমার শরীর ভাল নয়। কে আমার সঙ্গী হবে বলুন তো! দেখাবেন প্লিজ?

কীসে ঘুরবেন? হেঁটে?

কেন, আপনার রিক্সায়!

মেয়েটা অপমান করতে চাইছে কি না বুঝবার জন্য অতীশ চকিতে তার দিকে তাকাল।

মেয়েটার মুখে একটু রসিকতা নেই। একটু ঝুঁকে চাপা আন্তরিক গলায় বলল, আপনি রিক্সা চালান জেনে আমি ভীষণ ইমপ্রেসড। মুভড়। এরকম সাহস কারও দেখিনি। আমি আপনার সঙ্গেই ঘুরতে চাই। রিক্সা চালিয়ে আপনি এই সমাজকে শিক্ষিত করছেন। আপনাকে শ্রদ্ধা করা উচিত।

অতীশের হাসি পাচ্ছিল। এত শক্ত কথা সে ভাবেনি। বলল, আচ্ছা।

কালকেই। সকালে যখনই আপনার সময় হবে। প্লিজ!

বাড়ি ফিরে যখন কুঁচকিতে গরম চুন-হলুদ লাগাচ্ছিল তখন অতীশ মাকে জিজ্ঞেস করল, ও বাড়ির দীপ্তিকে চেনো?

কে দীপ্তি? বন্দনার সেই পিসতুতো বোনটা নাকি?

হ্যাঁ।

বড়দি সেলাই করতে করতে বলল, পাজির পা ঝাড়া।

মা বলল, স্বামীটা তো ওর জ্বালাতেই বিষ খেয়ে মরল। একটা দু বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা। স্বামী এক কাঁড়ি টাকা রেখে গেছে। পায়ের ওপর পা তুলে খাচ্ছে।

অতীশ অবাক হয়ে বলল, বিধবা? কই, দেখে মনে হল না তো!

মা একটু বিষ মেশানো গলায় বলে, মনে হবে কী করে? জেঁড়েমুশে মাছ মাংস খাচ্ছে, রংচঙে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেন্ট পাউডার লিপস্টিক মাখছে, কুমারী না বিধবা তা বোঝার জো আছে।

বড়দি দাঁতে একটা সুতো কেটে বলল, চরিত্রও খারাপ।

মেয়েদের এই একটা দোষ। কারও কথা উঠলেই তার দোষ ধরে নিন্দেমন্দ শুরু করে দেবে। এ বাড়িতে সেটা খুবই হয়ে থাকে। মা আর দিদিদের প্রিয় পাসটাইম।

মা বলল, হঠাৎ ওর কথা কেন?

অতীশ গীর গলায় বলল, আলাপ হল।

বড়দি বলল, তবে মেয়েটার গুণও আছে। নাচ গান জানে, লেখাপড়া জানে। কলেজে পড়ায়।

মা বলল, অমন লেখাপড়ার মুখে আগুন।

ব্যাগটা উপুড় করল মা। তারপর জিনিসপত্রের দিকে চেয়ে থেকে বলল, এই দিল? চাল তো আধ কেজিও হবে না। এই নাকি ভুজ্যি? কাঁচা পেপে, ছটা আলু, উচ্ছে, দুটো বেগুন, আর দশটা টাকা মোটে দক্ষিণা! বড় বাড়ির নজর নিচু হয়ে যাচ্ছে। আগে কত দিত।

বড়দি বলল, কর্তামা আর পারে না। ওদের আয় কী বল তো!

নেই-নেই করেও আছে বাবা। পুরনো জমিদারদের কত কী লুকোনো থাকে।

কর্তামার নেই মা। তার দরাজ হাত। থাকলে কি বাড়ি বিক্রি করার কথা ভাবত?

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

যখন অনেক রাতে খাঁটিয়া নিয়ে ইস্কুলবাড়ির বারান্দায় শুতে যাচ্ছিল অতীশ তখনও ওই দুটো চোখ বার বার ছোবল দিচ্ছিল তাকে। একটা মৃদু বিষ নেশার মতো আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। একটা ফিকে জ্যোৎস্ন উঠেছে আজ। চারদিক ভূতুড়ে। শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। মাঝরাতে দূরে বোমার শ শুনতে পেল, পুলিশের জিপ আর ভ্যান দ্রুত চলে গেল, কোথায় একটা সমবেত চিৎকার উঠল।

প্রদীপদা খুন হল রথতলার তেমাথায়। রাত তখন দেড়টা বা দুটো। তারা চারজন ছিল। প্রদীপদা, সে, দলের আর দুটো ছেলে। রথতলার তেমাথার কাছ বরাবর সুনসান রাস্তায় আচমকা অন্ধকার কুঁড়ে আট দশ জন ছেলে দৌড়ে এল বাঁ দিক থেকে। মুখে কালিঝুলি মাখা। হাতে রড, চপার, ড্যাগার। আত্মরক্ষার জৈব তাগিদের বশেই তাদের দলের দুটো ছেলে ছিটকে পালিয়ে গেল। প্রদীপ-গোঁয়ার প্রদীপ পালাল না। সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, অ্যাই, কী হচ্ছে? কী চাও তোমরা?

ব্যস, ওইটুকুই বলতে পেরেছিল প্রদীপ। পরমুহূর্তেই ঘিরে ফেলেছিল আততায়ীরা। চার-পাঁচ হাত পিছনে দাঁড়িয়ে শরীরে স্তন টের পেয়েছিল অতীশ। পালায়নি, কিন্তু সেটা বীরত্বের জন্য নয়। ভয় আর বিস্ময়ে তার শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন দৌড়ে এসেছিল তেমনি দৌড়ে আবার অন্ধকারে পালিয়ে গেল ওরা। অতীশ খুব ধীরে, সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেল প্রদীপের কাছে। প্রদীপের শরীর থেকে প্রাণটা তখনও বেরোয়নি। খিচুনির মতো হচ্ছে। শরীরটা চমকে চমকে উঠছে। গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা গার্গলের মতো শব্দ হচ্ছিল। রক্তে স্নান করছিল প্রদীপ। ওই রক্তের মধ্যেই হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করছিল অতীশ, প্রদীপদা! প্রদীপদা!

একবার চোখ মেলেছিল প্রদীপ। কিন্তু সে চোখ কিছু দেখতে পেল না। তারপর ধীরে ধীরে খিচুনি কমে এল। শরীরটা নিথর হয়ে গেল।

গোটা মৃত্যুদৃশ্যটা প্রায় নিপলক অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিল অতীশ। এইভাবে মানুষ মরে!

দলের ছেলেরা এল একটু বাদে। তুমুল চিৎকার করছিল তারা। রাগে, আক্রোশে। প্রদীপদাকে কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তখন ঘাড় লটকে গেছে, হাতপাগুলো ঝুলছে অসহায়ের মতে, শরীরে প্রাণের লেশটুকু নেই।

বাবুদা তাকে ধরে তুলে নিয়ে এল সুবিমল স্যারের বাড়িতে। বলল, কী হয়েছিল সব বল।

প্রথমটায় কথাই এল না তার মুখে। জিভ শুকিয়ে গেছে, ভাষা মনে পড়ছে না। তাকে জল খাওয়ানো হল, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল। তারপর বলতে পারল হেঁচকি আর কান্না মিশিয়ে।

পুলিশ তাকে জেরায় জেরায় জেরবার করে ছেড়েছিল। কর্তামা তাকে জর্জরিত করেছিলেন বিলাপে, তুই ছিলি, তবু বাঁচাতে পারলি না ওকে? কীসের বন্ধু তুই? কেমন বন্ধু?... ওরে, সেই সময়ে কি একবার মা বলে ডেকেছিল? জল চেয়েছিল? নিরীহ মানুষ কতবাবু পর্যন্ত বন্দুক নিয়ে খুনিকে মারবেন বলে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কাকে মারবেন তিনি? আততায়ী কি একজন? পরে পুলিশ তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বন্দুক নিয়ে যায়।

সেই ঘটনার পর পলিটিকস থেকে সরে এল অতীশ। তারপর থেকেই সে একা হয়ে গেল। সংকীর্ণ করে নিল নিজের জীবনযাপনকে। পলিটিকস সে সত্যিকারের করেওনি কখনও। শুধু প্রদীপদার সঙ্গে লেগে থাকত বলে যেটুকু করা। তখন মাত্র উনিশ কুড়ি বছর বয়স, সেই বয়সে বুঝতও না কিছু।

পাড়ার মধ্যে একটা হুটোপাটির শব্দ পাওয়া গেল। একদল ছেলে দৌড়ে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে। একটা কুকুর কেঁদে উঠল শাঁখের মতো শব্দ তুলে। একটা টর্চ জ্বলে উঠল কোথায় যেন। নিবে গেল ফের।

কাল সকালে উঠে একটু দৌড় প্র্যাকটিস করতে হবে। তারপর বেগুনের দাম তুলতে হবে। বাবার জ্বর না ছাড়লে আলুর দোকানে বসতে হবে। দুপুরে প্রগতি সংঘের স্পোর্টসে নামতে হবে। আর...আর.দীপ্তিকে রিলায় গপিয়ে শহর দেখাতে হবে।

কাছেপিঠে দুম দুম করে উপযুপরি দুটো বোমা ফাটল। একটা মস্ত হাই তুলল অতীশ। ঘুম পাচ্ছে। ইস্কুলবাড়ির খোলা বারান্দায় আজকাল গভীর রাতে বেশ ঠাণ্ডা লাগে। ভোর রাতে রীতিমতো শীত করে। গায়ে চাদরটা টেনে সে শুয়ে পড়ল। দুখানা মায়াবী, রহস্যময় চোখ তার দুচোখে চেয়ে রইল। ওই চোখ দুখানাই তাকে পৌঁছে দিল ঘুমের দরজায়। ঘুমের মধ্যেও যেন চেয়ে রইল তার দিকে। পলকহীন, হিপ্নোটিক।

৩. একটা খোকা হয়েছে

তাদের একটা খোকা হয়েছে। তারা খুব কষ্টে আছে, অভাবের কষ্ট, মনের কষ্ট, ছেলেমেয়ের জন্য মন-কেমন করা। যদি ফিরে আসতে চায় তবে রেণু কি কিছু মনে করবে? এটুকু কি মেনে নিতে পারবে না? তারা না হয় নীচের তলায় স্টোর রুমে থাকবে, মুখ দেখাবে না। রমার হাঁফানি আবার বেড়েছে, কে জানে বাঁচবে কি না, ছোট খোকাটারও বড্ড অসুখ হয় ঘুরে ঘুরে। রেণু কি পারবে রমাকে একটু মেনে নিতে? জীবনের তো আর খুব বেশি বাকি নেই। কে কতদিনই বা আর বাঁচবে? আয়ু তো ফুরিয়েই আসছে। রেণু কি পারবে না সেই কথা ভেবে ক্ষমা করে নিতে?

পাছে ডাকে চিঠি মারা যায় এবং পাছে ডাকের চিঠির জবাব মা না দেয় এবং পাছে নিজের ঠিকানা রেণুকে জানাতে হয় সেই জন্যই চিঠিটা মেঘনাদ পাঠিয়েছেন দীপ্তির হাতে।

চিঠিটা নিয়ে মা গভীর রাতে বিছানায় এল। তাকে ডেকে বলল, পড়।

বন্দনা অবাক হয়ে চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, কার চিঠি মা?

তোর বাবার।

বাবা! গলায় যেন একটা আনন্দের ঝাপটা লাগল। বাবা চিঠি দিয়েছে! এর চেয়ে বড় খবর আর কী হতে পারে? চিঠিটা খুলল বন্দনা, তারপর ধীরে ধীরে পড়ল। প্রত্যেকটা শব্দ দুবার তিনবার করে। এ তার বাবার হাতের লেখা। এ চিঠিতে বাবার স্পর্শ আছে। আনন্দ আর বিষাদের একটা উথালপাথাল হচ্ছিল বুকের মধ্যে। চিঠি পড়তে পড়তে চোখ ভরে জল এল। বাবাকে কত কাল দেখে না বন্দনা! মা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। কিন্তু চেয়ে থাকা আর দেখা তো এক জিনিস নয়। মায়ের দু চোখও ভেসে যাচ্ছিল জলে।

কত বড় অপমান বল তো? রমাকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে থাকতে চাইছে। আমার চোখের ওপর! আমার নাকের ডগায়! এমন নির্লজ্জও হয় মানুষ!

কেঁদো না মা। কেঁদো না। বাবা তো লিখেইছে, খুব কষ্টে আছে।

কষ্টে তো থাকবেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে না! বিনা দোষে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল, ছেলেমেয়ে দুটোর কথা পর্যন্ত ভাবল না একবার। প্রেমে এমন হাবুডুবু খাচ্ছিল যে নিজের মুরোদ কতটুকু তা অবধি মনে ছিল না। এখন তো কষ্ট পাবেই।

বাবাকে তুমি কী লিখবে মা?

কী লিখব? কিছু লিখব না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক। এ চিঠির আমি কোনও জবাব দেব না। ঠিকানাটা পর্যন্ত জানানোর সাহস হয়নি। পাছে আমি পুলিশ লেলিয়ে দিই। এই তো মুরোদ।

দীপ্তিদি বাবার ঠিকানা জানে না মা?

বলছে তো জানে না। সত্যি বলছে কি না কে জানে। হয়তো জানে, বলতে চাইছে না। ও হয়তো বারণ করে দিয়েছে।

দীপ্তিদি কি চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসেছে মা?

তাই তো মনে হচ্ছে, নইলে হুট করে আসবে কেন? এতদিন তো খোঁজখবরও নেয়নি। চিঠিটা হাতে দেওয়ার আগে অনেক নাটক আর ন্যাকামি করে নিল। রাতের খাওয়ার পর ওর ঘরে ডেকে নিয়ে কিছু মনে কোরো না মামি, রাগ কোরো না মামি এইসব বলে খুব মামার দুর্দশার ইতিহাস শোনাল। মামার খাওয়া জোটে না, রোগা হয়ে গেছে। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে, বাজারে অনেক দেনা, এইসব। মামা নাকি আমাদের জন্য দিনরাত কাঁদে, বোনের কাছে গিয়ে দুঃখের কথা বলে। কত কী। এইসব ভূমিকা করে চিঠিটা বের করে দিল।

মায়ের কঠোর মুখখানার দিকে চেয়ে বুক শুকিয়ে গেল বন্দনার। তার মা কাঁদছে বটে, কিন্তু কাঁদছে ঘেন্নায়, আক্রোশে, অপমানে। বাবাকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না মা। কিন্তু বন্দনার বুকটা ব্যথিয়ে উঠছে বাবার কষ্টের কথা জেনে। তার ভাবে ভোলা, কবির মতো মানুষ বাবা যে কখনও কোনও কষ্ট সহ্য করতে পারত না।

দীপ্তিকে কী বলেছে জানিস?

কী মা?

বলেছে চিঠিটা পড়ার সময় আমার মুখের ভাব কেমন হয় তা যেন ভাল করে লক্ষ করে। দীপ্তিই হাসতে হাসতে বলছিল। আরও বলল, মামা তোমাকে এত ভয় পায় যে তোমার কথা উঠলেই কেমন যেন ফ্যাকাসে আর নাভাস হয়ে যায়। এসব ন্যাকামির কথা শুনলে কার না গা জ্বলে যায় বল তো।

বন্দনা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, বাবা তো তোমাকে একটু ভয় পায় মা।

ছই পায়। ভয় পেলে আমার নাকের ডগায় রমার সঙ্গে ঢলাঢলি করতে পারত?

বন্দনা তার দুর্বল দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবাকে ছাড়া কত দিন কেটে গেল আমাদের বলো তো! বাবার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। যদি সত্যিই না খেতে পেয়ে বাবা মরে যায় তখন কী হবে মা?

তার আমি কী করব? যদি এসে সত্যিই হাজির হয় তা হলে তো তাড়াতে পারব না। এ বাড়ি-ঘর তো তারই। আমি কে? যদি সত্যিই আসে তা হলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

দীপ্তিদিকে তুমি কিছু বলেছ মা?

এখনও বলিনি। কাল বলে দেব, ওর মামা ইচ্ছে করলে আসতে পারে। বিষয়-সম্পত্তির মালিক তো সে-ই। তবে যদি আসে তা হলে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

কোথায় যাবে মা?

এ শহরে থাকার অনেক জায়গা আছে।

বন্দনা চুপ করে রইল। তারা কেউই অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারল না। ঈছাট বোমার আওয়াজ শুনল। পুলিশের জিপ কতবার টহল দিল পাড়ায়। মাঝে মাঝে কিট চেঁচামেচি হচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দনা খুব নরম সতর্ক গলায় ডাকল, মা।

কী?

ধরা গলায় বন্দনা বলল, বাবার জন্য আমার মন বড় কেমন করছে মা। বাবাকে খু দেখতে ইচ্ছে করে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওই সর্বনাশীকে কেন যে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম! দীপ্তি বলছিল, রমার নাকি শরীর খুব খারাপ। হাঁফানিতে যদি মরত তা হলেও হাড় জুড়োত। কিন্তু শুনতে পাই হাঁফানির রুগিরা নাকি অনেককাল বাঁচে।

রমা মাসির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল বন্দনার। কী করুণ আর সুন্দর মুখখানা! রমা মাসি মরে গেলে কি খুশি হবে বন্দনা? একটুও না। রমা মাসি বেঁচে থাকুক, বাবা ফিরে আক, মা আর বাবার মিলমিশ হয়ে যাক হয় না এরকম? ভগবান ইচ্ছে করলে হয় না?

মা বলল, তার ওপর আবার বুড়ো বয়সে ছেলে হয়েছে। ঘেন্নায় মরে যাই। লজ্জা শরমের যদি বালাই থাকত। ফিরে তো আসতে চাইছে, এসে পাঁচজনকে মুখ দেখাবে কোন লজ্জায়? লোকে ছিছি করবে না? গায়ে থুথু দেবে না?

বন্দনার কাছে তার বাবা যা, মায়ের কাছে তো বাবা তা নয়। বাবা শত অপরাধ করে থাকলেও বন্দনার বুক ভরে আছে বাবার প্রতি ভালবাসায়। বাবার অপরাধ তার কাছে ক্ষমার যোগ্য মনে হয়। মায়ের কাছে তো তা নয়। তার মতো করে বাবাকে কেন যে ভালবাসতে পারে না মা সেইটেই বুঝতে পারে না বন্দনা।

অন্য পাশ ফিরে সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। বাবার জন্য বড় ভার হয়ে আছে বুক। বাবা খেতে পায় না, বাবা বড় কষ্টে আছে। তার চোখ ভেসে যায় জলে।

মাও যে ঘুমোতে পারছে না তা টের পায় বন্দনা। মা ছটফট করছে। এপাশ ওপাশ করছে। উঠে উঠে জল খাচ্ছে।

মা আর বাবার কি আর কোনওদিন মিলমিশ হবে না ভগবান?

দীপ্তি অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। ভোরবেলা দুবার তার ঘরে গিয়ে ফিরে এল বন্দনা। আটটা নাগাদ যখন দীপ্তি উঠে ব্রাশে পেস্ট লাগাচ্ছে তখন গিয়ে বন্দনা তাকে ধরল।

আমাকে বাবার কথা একটু বলবে দীপ্তিটি?

দীপ্তি খুব সুন্দর করে হাসল। বলল, আয়, বোস। তোকে মামি কিছু বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ। বাবার চিঠি পড়ে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবা বুঝি তোমাদের বাড়ি যায়?

আগে যেত না। মামা তো লাজুক মানুষ। একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলায় খুব লজ্জায় ছিল। তবে ইদানীং যায়।

বাবার কি খুব কষ্ট দীপ্তিদি?

দীপ্তির মুখখানা উদাস হয়ে গেল। বলল, কষ্ট! সে কষ্ট তোরা ভাবতেই পারবি না। হাওড়ার একটা বিচ্ছিরি বস্তির মধ্যে একখানা ঘর ভাড়া করে আছে। অন্ধকার,

স্যাঁতস্যাঁতে। বাথরুম নেই, কল নেই। রাস্তার কলে গিয়ে চান করতে হয়। বরোয়ারি পায়খানা। একদম নরক। যে ঘরে থাকে সেখানেই ভোলা উনুনে রান্নাবান্না। মামাকে দেখলে চিনতে পারবি না, এত রোগা হয়ে। গেছে। মাথার চুল প্রায় সবই উঠে গেছে। একটা লোহার কারখানায় কী যেন সামান্য একটা চাকরি করে, উদয়াস্ত খাটায় তারা। কী যে অবস্থা, দেখলে চোখে জল আসে।

শুনতে শুনতেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল বন্দনা। বলল, আরও বলো দীপ্তিদি।

কেন শুনতে চাস? যত শুনবি তত কষ্ট। অমন একটা সুখী শৌখিন মানুষের যে কী দুর্দশা হয়েছে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

কাঁদতে কাঁদতে বন্দনা বলল আমাদের কথা বলে না?

বলে না আবার! তোদের কথা বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদে।

বন্দনার হিক্কা উঠছিল। বলল, আমাকে ঠিকানাটা দেবে দীপ্তিদি? ঠিকানা! সেই বস্তির কি ঠিকানা-ফিকানা আছে? থাকলেও ঘরের নম্বর-টম্বর তো জানি না। একদিন মামা আমাকে আর মাকে নিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার মুখেভাত হল তো, আয়োজন টায়োজন কিছু করেনি। একটু পায়েস বেঁধে মুখে ছোঁয়াল। সেদিনই মাকে আর আমাকে নিয়ে গিয়েছিল জোর করে। বলল, আমার তো আর এখানে স্বজন কেউ নেই, তোরাই চল। তাই গিয়েছিলাম। গিয়ে মনে হল, না এলেই ভাল হত। বাচ্চাটাও হয়েছে ডিগডিগে লোগা। এত দুর্বল যে জোরে কাঁদতে অবধি পারে না।

বন্দনা আকুল হয়ে বলল, কী হবে বলো তো দীপ্তিদি?

পেস্ট মাখানো ব্রাশটা হাতে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দীপ্তি। তারপর বলল, মামি বোধহয় রাজি হবে না, না?

মা বলছে বাবা এ বাড়িতে এলে মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

সে তো ঠিক কথাই। এ তো আর আগের যুগ নয় যে, পুরুষমানুষরা দুটো-তিনটে বউ নিয়ে একসঙ্গে থাকবে। মামাকে আমি সে কথা বলেছি। একজনকে ডিভোর্স করো।

বাবা কী বলল?

মামা কাউকে ত্যাগ করতে পারবে না। বড্ড নরম মনের মানুষ তো, একটু সেকেলেও।

বন্দনা ধরা গলায় বলল, আমার বাবা বড্ড ভাল। কিন্তু বুদ্ধি নেই। ওই রমা মাসিই তো সব গণ্ডগোল করে দিল।

দীপ্তি বন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর তাই মনে হয়? আমার কিন্তু রমাকে খারাপ লাগেনি। খুব নরম সরম, খুব ভিতু আর ভদ্র। সে বারবার বলছিল, ডিভোর্স করলে আমাকেই করুক। আমাদের তো তেমন করে বিয়েও হয়নি। কালীঘাটের বিয়ে, ওটা না মানলেও হয়। কিন্তু রেণুদি তো ওঁর সত্যিকারের বউ। আমি রাক্ষসী, রেণুদির সর্বনাশ করেছি।

রমা মাসিকেই কেন ডিভোর্স করুক না বাবা।

দীপ্তি করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, সেটা কি খুব নিষ্ঠুরতা হবে না? রমা কোথায় যাবে বল তো! বাপের বাড়িতে গেলে ঝেটিয়ে তাড়াবে। আর তো ওর কেউ নেই। মামা ত্যাগ করলে ওকে ভিক্ষে করতে হবে। নইলে সুইসাইড।

বন্দনা একটু শিউরে উঠল। না, সে ওসব চায় না। রমা মাসিকে তার কখনও খারাপ লাগত না। শুধু বাবার সঙ্গে ওরকম হল বলে

দীপ্তি বলল, মামা কিছুতেই রমাকে ছাড়তে পারবে না। দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসে। অত অভাব, অমানুষিক কষ্ট, তবু ভালবাসে। এ যুগে এরকমটা ভাবাই যায় না।

এই ভালবাসার কথা শুনে বন্দনার একটুও ভাল লাগল না। বাবা কেন রমা মাসিকে এত ভালবাসছে? বাবার তো ভালবাসার কথা মাকে।

দীপ্তি বাথরুমে গেলে বন্দনা এল পড়ার ঘরে। অস্থির। এ ঘরে বিলু শোয়। এখনও ঘুমোচ্ছ পড়ে।

এই বিলু, ওঠ! উঠবি না?

কয়েকবার নাড়া খেয়ে বিলু উঠল।

কী রে দিদি? তুই কাঁদছিস কেন?

তোর বাবার কথা মনে হয় না?

বিলু অবাক হয়ে বলে, কেন হবে না? বাবার কী হয়েছে?

কিছু হয়নি। বাবা এখন খেতে পায় না জানিস? খুব কষ্টে আছে।

কে বলল?

বাবার চিঠি এসেছে। দীপ্তিদি সব জানে।

বিলু ঘুম-ভাঙা চোখে একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল। ছেলে বলেই বোধহয় বিলু খানিকটা ভুলে থাকতে পারে। তার আছে বাইরের জগৎ, আছে খেলা, আছে নানা কৌতূহল। বন্দনার ততটা নয়। অসুখে পড়ে থেকে সে সারাক্ষণ বাবার কথা ভেবেছে। তার অসুখ হলে বরাবর বাবা এসে বিছানায় সারাক্ষণ পাশে বসে থাকত। বড় নরম মনের মানুষ।

বিলু হঠাৎ বলল, বাবা কী চাকরি করে?

একটা কারখানায় কী যেন করে। সামান্য কাজ।

বিলু আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, তোকে কাঁদতে দেখে আমি ভেবেছিলাম বাবা বুঝি মরেটরে গেছে।

যাঃ। কী যে বলিস!

বিলুও উঠে কলঘরে গেল। পড়ার টেবিলে চুপ করে বসে রইল বন্দনা। তার সামনে সমস্যাটা যেন একবোঝা জট-পাকানো উল। তাতে গিট, ফাঁস, জড়িয়ে মুড়িয়ে একশা। বাবা, মা, রমা মাসি এই তিনজন মিলে কী যে একটা পাকিয়ে তুলল!

বাবুদা এল সাড়ে আটটা নাগাদ। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। পরনে ধুতি আর সাদা শার্ট। বাবুদাকে প্যান্ট ট্যান্ট পরতে কখনও দেখেনি বন্দনা। মুখখানা সর্বদাই ভদ্রতায় মাখা। সবসময়ে নরম গলায় কথা বলে। কথাবার্তায় শিক্ষা আর রুচির ছাপ আছে। বাবুদা একা নয়, সঙ্গে কয়েকটা ছেলে। এ বাড়ির আজকাল আর আগল নেই। বাবুদা সোজা ওপরে উঠে এল।

বন্দনা দরদালানে লেনিনের ছবিটার নীচেই একটা চেয়ারে বসে একখানা শরৎ রচনাবলী পড়ার চেষ্টা করছিল। আজ মন বসছে না। মনটা বড্ড উড়ুউড়ু। মনটা বড় খারাপ। নইলে আজও সোনালি মিঠে রোদ উঠেছে। আজও সুন্দর দিনটি। শুধু বন্দনার চোখই সুন্দর দেখছে না কিছু।

বাবুদাকে দেখে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে। বাবুদা বলল, উঠতে হবে না। বোসো। তুমি খুব ভুগে উঠলে, না?

হ্যাঁ। আমার টাইফয়েড হয়েছিল।

খুব রোগা হয়ে গেছ।

হ্যাঁ।

মাসিমা কোথায়?

বাবুদাকে দেখলে বা কথাবার্তা শুনলে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে, গতকাল এই বাবুদাই দলবল নিয়ে ল্যাংড়াকে ঢিট করতে এসেছিল। কেউ বিশ্বাস করবে না এই বাবুদা কাল ওরকম সাজ্ঘাতিক বোমাবাজি করে গেছে।

বন্দনা বলল, আপনি বসুন, মাকে ডাকছি।

মা রান্নাঘরে জলখাবারের তদারকি করছিল। মুখখানা ভার, বিষণ্ণ। সারা রাত মা ঘুমোয়নি, জানে বন্দনা।

মা, বাবুদা এসেছে। তোমাকে ডাকছে।

মা বিরক্ত হল। বলল, কী চায় বাবু?

তা জানি না।

মা আঁচলে হাতটা মুছতে মুছতে বলল, যা, যাচ্ছি।

মা আসতেই বাবুদা চেয়ার ছেড়ে বিনয়ী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।

কেমন আছেন মাসিমা?

আমি ভাল নেই। বড় অশান্তিতে আছি। কিছু বলবে?

হ্যাঁ মাসিমা। কাল ল্যাংড়া আর তার দলের ছেলেরা ও বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে আমাদের ওপর বোমা মেরেছে।

জানি।

ও নাকি এখানে একটা ডেরা করেছে?

তা করেছে।

আমাদের সেটা কেন জানাননি মাসিমা? জানালে আমরা কবে ওকে সরিয়ে দিতাম।

কাকে বারণ করব বলো তো? আজকাল আমার বাগানে কত লোক সারাদিন ঢোকে। নারকেল পেড়ে নিয়ে যায়, গাছ থেকে ফল নিয়ে যায়, ফুল নিয়ে যায়। এমনকী আজকাল ছাগলও বেঁধে রেখে যায় দেখছি। দেয়াল সারালে হয়তো হয়। কিন্তু তার অনেক খরচ। মিস্ত্রিরা বলে গেছে ত্রিশ ফুট দেয়াল ভেঙে ফেলে নতুন করে গাঁথতে হবে।

সেটা পরের কথা। ল্যাংড়া যাতে এখানে কতে না পারে তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আপনি পারমিশন দিলে আমাদের দলের কয়েকটা ছেলে পালা করে পাহারা দেবে। তারা ভাল। ছেলে।

মা কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, পাহারা দেবে?

আপনার আপত্তি থাকলে নয়। আপনাদের পিছনের দিকের ফাঁকা গোয়ালঘরটায় বসেই বোধহয় ওরা বোমা বাঁধে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ বাড়ি কি রক্ষা হবে বাবু? বড্ড ভয় পাচ্ছি।

আমাদের জানালে এত কাণ্ড ঘটত না।

বড় বাড়ির অবস্থা কি আর তোমরা জানো না। দুটো নাবালক ছেলেমেয়ে, বুড়ো মালি, বাহাদুর আর মদনকে নিয়ে থাকি। আমাদের সহায়-সম্বল তো কিছু নেই। কাল কিন্তু বাইরে থেকেও বাড়ির ভিতরে বোমা পড়েছে।

জানি মাসিমা। কাজটা উচিত হয়নি। আমি ক্ষমা চাইছি। তা হলে অনুমতি দিচ্ছেন?

তোমার দলের ছেলেরা আবার অশান্তি করবে না তো? ধরো যদি ল্যাংড়া ঢুকতে চায় তবে তারা হয়তো মারদাঙ্গা করবে।

না মাসিমা। ল্যাংড়া বাড়াবাড়ি করলে তারা গিয়ে শুধু আমাদের খবর দেবে।

তাতে যদি আমাদের ওপর ল্যাংড়ার আক্রোশ হয়?

অত ভয় পাবেন না মাসিমা। গুণ্ডাবাজি খতম করার চেষ্টাই তো আমরা করছি। ল্যাংড়া ভয় পেয়ে পালিয়েছে। সে তেমন কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই।

দেখো বাবা, আমি কিন্তু খুব অসহায় মানুষ।

অসহায় কেন মাসিমা? আমরা তো আছি। আমরা সবাই প্রদীপের বন্ধু। প্রদীপের মতো সাহসী ছেলে কটা হয়? আপনি একজন সাহসী সৈনিকের মা।

মায়ের চোখ ছলছল করে উঠল। আঁচলে চোখ চেপে ধরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ঠিক আছে।

বাবু যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল তখন মা তাকে আবার ডাকল, বাবু, শোনো।

কী মাসিমা?

আমাকে সস্তায় একটা বাসার খোঁজ দিতে পারো? বাসা?

কেন মাসিমা?

আমার বড় দরকার। একখানা ঘর হলেও চলবে। কিন্তু ভাড়া বেশি যেন না হয়। তুমি তো অনেককে চেনো, একটু খোঁজ নেবে?

ঠিক আছে।

খুব তাড়াতাড়িই চাই কিন্তু।

দেখব মাসিমা।

বাবু চলে যাওয়ার পর বন্দনা অবাক হয়ে বলল, কার জন্য বাসা খুঁজছ মা? কে থাকবে?

আমরা থাকব। তুই, আমি আর বিল।

কেন মা?

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি তোর বাবাকে একটা চিঠি লিখব। বলব চলে আসুক সে। তার বাড়িঘর বুঝে নিক। সুখে থাকুক। আমি তার পথের কাঁটা, সরে যাব।

এত তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেললে মা? বাবা তো লিখেছে আমাদের জন্যও তার মন কেমন করে। তাই আসতে চাইছে।

তুই কিছু বুঝিসনি। আসল কথা, নিজের বাড়ি দখল চাইছে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা লিখলেও আসল কথা হল তাই।

বন্দনা কী করে মাকে বোঝাবে যে, বাবা মোটেই বাড়ির দখল চায়নি। বাবা চেয়েছে এ বাড়ির এক কোণে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরে ভিখিরির মতো একটু আশ্রয়। তার বাবা একটা গর্হিত অন্যায় করে ফেলেছে ঠিকই, তবু বাবা একজন চমৎকার মানুষ। একজন কবির মতো মানুষ। একজন নরম ও উদাসী মানুষ।

মা সে কথা বুঝল না। বলল, তাকে তোরা আর কতটুকু চিনিস? আমি চিনি হাড়ে হাড়ে। চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে এ বাড়িতে থাকতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে। এখন সে এসে নতুন বউ, নতুন ছেলে নিয়ে সুখের সংসার পাতুক। আমরা বিদেয় হয়ে যাব।

কিন্তু বন্দনার এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। এ বাড়ির মধ্যে কত পুরনো বাতাস, কত অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা, কত স্বপ্নের মতো ব্যাপার আছে। এ বাড়ি ছেড়ে গিয়ে কি সে বাঁচবে?

সকাল নটায় একটা রিক্সা এসে সামনের উঠোনে থেমে পক পক করে হর্ন দিচ্ছিল। শরৎ রচনাবলী রেখে বন্দনা গিয়ে বুকে দেখে অবাক। রিক্সায় অতীশ সিটে বসে আছে। উর্ধ্বমুখে চেয়ে আছে বারান্দার দিকে। দেখে বন্দনার ভিটা জ্বলে গেল।

কী চাও!

অতীশ গম্ভীর মুখে বলল, তোমার কলকাতার দিদি আসতে বলেছিল। শহর দেখবে।

তোমার রিক্সায়?

হ্যাঁ।

রাগে এত গরম হয়ে গেল তার মাথা যে সে কিছুই বলতে পারল না। খানিকক্ষণ জ্বালাভরা চোখে অতীশের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, তুমি না একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিলে?

হ্যাঁ।

তবু চালাচ্ছ?

গাড়ি চালালে একটা দুটো অ্যাকসিডেন্ট হয়ই।

এত অপমান লাগছিল বদনার যে, বলার নয়। সে উঠে দীপ্তির ঘরে গেল।

এই দীপ্তিদি।

দীপ্তি একটা হলুদ জমি, কালো টেম্পল পাড়ের শাড়ি পরছিল যত্ন করে। স্নান করে এসেছে। ভেজা চুল এলানো রয়েছে পিঠের ওপর। হাসিমুখে বলল, কী রে?

তুমি অতীশদাকে রিক্সার কথা বলেছ?

হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে গেল দীপ্তির। চোখ উজ্জ্বল হল। বলল, কী সাঙ্ঘাতিক ছেলে বল তো!

সাঙ্ঘাতিকটা আবার কীসের দেখলে?

বিকম পাশ, ওরকম ভাল চেহারা, কী ভাল সংস্কৃত উচ্চারণ, ভাল অ্যাথলিট, সেই ছেলে রিক্সা চালায়, এটা একটা দারুণ ব্যাপার নয়?

আমার তো রাগ হয়।

আমার শ্রদ্ধা হয়। ও ছেলে যখন রিক্সা চালায় তখন সেইসঙ্গে এই সমাজকে যেন অপমান করে। যে দেশ ওরকম একটা ছেলের দাম দিতে পারে না, সে দেশকে এভাবেই অপমান করা উচিত।

বন্দনা এসব তত্ত্ব বোঝে না। তবে অতীশ রিক্সা চালালে তার ভীষণ লজ্জা করে। সে কুঁকড়ে যায়।

প্লিজ দীপ্তিদি, তুমি ওর রিক্সায় উঠো না। আমি বাহাদুরকে পাঠিয়ে অন্য রিক্সা আনিয়ে দিচ্ছি।

দীপ্তি অবাক হয়ে বলে, ও মা! কেন রে? তুই কি ভাবিস আমার বেড়ানোর খুব শখ হয়েছে? তোদের অখাদ্য শহর দেখার একটুও ইচ্ছে আমার নেই। আমি ওর রিক্সায় উঠতে চেয়েছি, সেটা একটা থ্রিলিং এক্সপেরিয়েন্স হবে বলে। ও চালাবে, আমি বসে বসে দেখব রাস্তায় ভদ্রলোকদের মুখগুলো কেমন হয়ে যায়।

কাঁদো কাঁদো মুখে বন্দনা বলল, কিন্তু ও তো রিক্সাওলা নয় দীপ্তিদি! ওরা যে ভদ্রলোক! ও অমন বিচ্ছিরি লোক বলেই রিক্সা চালায়।

তুই অমন অস্থির হচ্ছিস কেন? ওর প্রতিবাদটা বুঝতে পারছিস না? টের পাস না যে এটা ওর বিদ্রোহ? ভদ্রতার মুখোশ টেনে খুলে দিতেই তো চাইছে ও। আমি এরকম সাহসী ছেলে দেখিনি।

বন্দনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে দৌড় পায়ে বেরিয়ে এল। দুর্বল শরীর সইল না, বারান্দায় এসে সে উবু হয়ে বসে পড়ল মুখ ঢেকে। নীচে অতীশের রিক্সা যেন তাকে ঠাট্টা করতেই হর্ন দিচ্ছে। পক পক।

দীপ্তির ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে বন্দনার। দীপ্তিদি যেন কী!

সে হামাগুড়ি দিয়ে রেলিঙের কাছে এগিয়ে গেল।

নীচে অতীশ তার রিক্সায় বসে আছে। সেদিকে চেয়ে থেকে বন্দনা মনে মনেই বলল, তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

অতীশ হঠাৎ উধ্বমুখ হয়ে বলে, তোমার দিদিকে তাড়াতাড়ি করতে বলো। মাত্র দু ঘণ্টার কড়ারে রিক্সা এনেছি। বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে গণেশকে রিক্সা ফেরত দিতে হবে।

রাগ করে ঘরে এসে শুয়ে রইল বন্দনা। তার রাগ হচ্ছে, তার অপমান লাগছে। আজকের দিনটা তার ভাল যাচ্ছে না। শুয়ে শুয়েই সে শুনতে পেল দীপ্তিদির হালকা চটির শব্দ চটুল গতিতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। রিক্সা দুবার হর্ন দিল, পক পক।

ঘরের মধ্যে কান্না পাচ্ছে বন্দনার। হাঁফ ধরে যাচ্ছে, আজ কী ভীষণ খারাপ একটা দিন।

শরৎশেষের সকালবেলায় চমৎকার একটা সোনালি আলো পাঠালেন ভগবান। সেই আলোর সঙ্গে পাঠালেন শিরশিরে উত্তুরে হাওয়া। আলো হাওয়ায় মাখামাখি হয়ে চারদিকে

নানা কাণ্ড ঘটতে লাগল। বাগানে গাছের ছায়ায় বেতের চেয়ারে বসে বন্দনা দেখছিল। মনে মনে নানা কথা, নানা উল্টোপাল্টা চিন্তা। বাবার চিঠিটা সে কতবার পড়েছে তার ঠিক নেই। শরৎ রচনাবলীর মধ্যে যত্ন করে রাখা চিঠিটা আবার বের করল। সস্তা খাম, এক্সারসাইজ বুক থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া পাতায় ডট পেন দিয়ে লেখা। চিঠিটার চেহারাই এমন গরিবের মতো যে, কষ্ট হয়। লজ্জার মাথা খেয়ে মাকে লেখা বাবার এই চিঠির ভিতর দিয়েই সে এই অকরুণ পৃথিবীকে খানিকটা বুঝে নিচ্ছিল।

বাবার চিঠিটা আর একবার খুলে পড়তে যাচ্ছিল বন্দনা, এমন সময়ে হঠাৎ সামনে যেন মাটি খুঁড়ে একটা ছেলে উঠে দাঁড়াল। এমন চমকে গিয়েছিল বন্দনা।

এঃ, তুই যে একদম শুঁটকি মেরে গেছিস! কী হল তোর?

বন্দনার বুকটা ধকধক করছিল, বলল, এমন চমকে দিয়েছিস!

অবু, অর্থাৎ অবিনশ্বর অতুলবাবুর ছেলে, শিখার ভাই এবং তারই সমবয়সী। শিখাদের বাড়িতে তারা একসঙ্গে কত ক্যারম লেখেছে! অবু বেশ লম্বা চওড়া, নবীন দাসের ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করে।

তোর কি অসুখ ফসুখ কিছু করেছিল নাকি রে বন্দনা?

টাইফয়েড।

তাই অত রোগা হয়ে গেছিস। তোকে চেনাই যাচ্ছে না। রোজ ছোলা ভেজানো খা, আর এক গ্লাস করে মোল, আর দু চামচ ব্র্যান্ডি মেশানো দুধ, দেখবি তাক এসে যাবে।

তোর মতো হোঁতকা না হলেও আমার চলবে।

আমি হোঁতকা নাকি? আমি হলাম মাসকুলার। বাইসেপ দেখবি?

মা গো! ওসব কিলবিলে মা দেখলে আমার বিচ্ছিরি লাগে। বোস না, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

আরে, বসবার জন্য কি এসেছি নাকি? তোদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছি।

পাহারা দিচ্ছিস! তার মানে?

তোদের বাড়িতে নাকি ল্যাংড়া একটা ঠেক করেছে! সেই জন্যই বাবুদা পাঠাল পাহারা দিতে। ল্যাংড়া অবশ্য পালিয়ে গেছে। তবু যদি আসে।

বন্দনা হেসে ফেলল, তুই একা পাহারা দিচ্ছিস! ইস, কী আমার বীর রে!

অবু একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমি একা নই। বিশ্বজিৎ আর অমল নামে দুটো ছেলেও আছে। ওদের রিভলভার আছে। আমি হচ্ছি মেসেনজার। কিছু হলে দৌড়ে গিয়ে খবর দিতে হবে বাবুদাকে।

বন্দনা ভয় পেয়ে বলল, রিভলভার! রিভলভার কেন বল তো!

অবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ভয় পেলি নাকি? আরে দূর, আজকাল রিভলভার টিভলভার হাতে হাতে ঘোরে। কোনও ব্যাপারই নয়। আজকাল রিভলভার হল খেলনা। আসল জিনিস হল স্টেনগান, এ কে ফর্টি সেভেন, এইসব।

তুই খুব পেকেছিস কিন্তু অবু।

অবু হি হি করে হাসল। সবে গোঁফের রেখা উঠেছে, ফসা, গোল মুখের অবু এখন কত ছেলেমানুষ। বলল, আজ তা হলে তুই কলসি রেসে নামছিস না?

বন্দনা লজ্জায় রাঙা হল। বরাবর সে প্রগতি সংঘের স্পোর্টসে কলসি মাথায় দৌড়ে নাম দেয়। আজ অবধি একবারও পারেনি। তার মাথা থেকে কলসি পড়বে কি পড়বেই। সে লজ্জায় হাসতে লাগল, যাঃ।

তোর ঠ্যাং দুটো খুব সরু সরু তো, তাই তোর ব্যালান্স নেই। ললিতাদি যোগ ব্যায়ামের ক্লাস খুলেছে। ভর্তি হবি? দুদিনে চেহারা ফিরিয়ে দেবে।

যাঃ। ব্যায়াম জিনিসটা এত বাজে আর একঘেয়ে।

আর শুঁটকি হয়ে থাকা বুঝি ভাল?

শুঁটকি আছি বেশ আছি, তোর তাতে কী? আজকাল রোগা হওয়াই ফ্যাশন, জানিস?

তা বলে তোর মতো রোগা নয়। তুই তো বারো মাস ভুগিস। আজ জ্বর, কাল সর্দি, স্কিপিং করলে পারিস।

ওসব আমার ভাল লাগে না। ক্যারম খেলবি অবু?

অবু তাঁর কবজির ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে বলল, ক্যারম খেলব কী রে? আমি এখন অন ডিউটি রয়েছি না। আমি এখন ব্ল্যাক ক্যাট। কম্যান্ডো। তোদের সিকিউরিটি গার্ড।

ল্যাংড়াকে দেখলেই তো পালাবি।

অবু হি হি করে হাসল। তারপর বলল, ল্যাংড়া তোদের বাড়িতে ঢুকে কী করে বল তো! বোমা ফোমা বাঁধে নাকি?

ঠোঁট উল্টে বন্দনা বলে, কে জানে কী করে! আমাদের বাড়িটা তো এখন খোলা হাট।

জানিস তো আজ অপরূপা দিদিমণি বস্তিতে মিটিং করবে! সবাইকে নাকি ডেকে ডেকে বলবে ল্যাংড়াকে সাপোর্ট করার জন্য। ল্যাংড়া নাকি পাড়ার লোকের উপকার করে বেড়ায়, পাড়ার জুয়ার ঠেক নাকি সেই ভেঙেছে, ল্যাংড়ার জন্যই মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশানে বাবুদাদের ক্যান্ডিডেট বিধুবাবু জিততে পারেনি। অপরূপাদি সবাইকে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। আমরা নাম দিয়েছি ল্যাংড়া বাঁচাও আন্দোলন।

বন্দনা করুণ মুখ করে বলল, কিন্তু অপরূপাদি দারুণ পড়াত। এত সুন্দর সুন্দর গল্প বলত ক্লাসে।

আরে সে তো আমিও জানি। দিদিও তো পড়ত ওর কাছে। কিন্তু ল্যাংড়ার সঙ্গে অ্যাফেয়ারের পর অপরূপাদি একদম ভোগে চলে গেছে। ল্যাংড়াকে পাটিতে ঢুকতে দিচ্ছে না কে জানিস তো। অপরূপাদি। আরে, আজকাল পাটির শেল্টার না পেলে কেউ কি কিছু করতে পারে? ল্যাংড়া যদি মরে তবে অপরূপাদিই কিন্তু রেসপনসিবল।

বন্দনা চোখ পাকিয়ে বলল, তুই এত পেকেছিস কবে থেকে রে? খুব পার্টি করে বেড়ানো হচ্ছে?

আরে না। পার্টি ফার্টি তারাই করে যাদের হাতে মেলা সময় আছে। আমার বলে হেভি পড়ার চাপ, তার ওপর বডি বিল্ডিং, সময় কোথায়? তবে বাবুদা বা সুবিমল স্যার বললে মাঝে মাঝে ফ্যাক খেটে দিই। বাবাকে তো জানিস, পার্টি করলে পুঁতে ফেলবে।

তা হলে করিস কেন?

সোশ্যাল ওয়ার্ক হিসেবে কিছু কিছু করি। পলিটিকস নয় বাবা। তোদের বাড়ি পাহারা দেওয়াটাও তো একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক, নাকি? আফটার অল তোরা একসময়ে আমাদের জমিদার ছিলি।.একটা দায়িত্ব আছে।

নাঃ, তুই সত্যিই খুব পেকেছিস।

অবু হি হি করে হাসল।

তোর ভয় করে না অবু?

কীসের ভয়?

জানিস তো, আমার দাদার কী হয়েছিল!

জানব না কেন? স্যাড ব্যাপার।

পিছন দিকে একটু দূরে একটা কর্কশ লাউড স্পিকারে মাইক টেস্টিং শুরু হতেই কথা থামিয়ে উৎকর্ণ হল। তারপর বলল, ওই বোধহয় অপরূপাদির মিটিং শুরু হল। যাই, শুনে আসি। ইন্টাররেস্টিং ব্যাপার হবে।

অবু হালকা পায়ে বাগানটা পার হয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে বেরিয়ে গেল। গাছের ঘয়ায় একা কুম হয়ে বসে রইল বন্দনা। হাতে বাবার চিঠি। মাথার মধ্যে কত চিন্তা ভেসে ভেসে ছায়া ফেলে যাচ্ছে। আজ তার মনে হল, পৃথিবীতে তাদের মতো দুঃখী মানুষ আর কেউ নেই।

সে শুনতে পাচ্ছিল, বহু দূরে একটা বিচ্ছিরি লাউড স্পিকারে অপরূপা দিদিমণি চিৎকার করে একটা ভাষণ দিচ্ছে। কী বলছে তা এত দূর থেকে শোনা গেল না। ল্যাংড়াকে বন্দনা পছন্দ করে ঠিকই, তবু অপরূপা দিদিমণি যে ওর জন্য এত বিপদ মাথায় নিয়েও একটা লড়াই করছে এটা খুব ভাল লাগে বন্দনার। সে নিজে তো কারও জন্য কখনও লড়াই করেনি। তার তো কোনও লড়াই নেই। ল্যাংড়া বাঁচাও আন্দোলন বলে অপরপাদিকে ঠাট্টা করে গেল বটে অবু, কিন্তু ঠাট্টা শুনে বন্দনার একটুও হাসি পায়নি। অপরূপাদিকে নিয়ে ঠাট্টা করার সে কে?

তার পোষা কয়েকটা কবুতর ছাদ থেকে নেমে এল ঝটপট করতে করতে। তারপর তার চেয়ার ঘিরে গুড়গুড় শব্দ করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনটা যেন একটু ভাল হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ফের অনেক কথার হয়া এসে পড়ল মনের ওপর।

দীপ্তিদিকে তার কেন আর একটুও ভাল লাগছে না? এই মস্ত ফাঁকা বাড়িটায় তারা তিনটি মোটে প্রাণী। সে, বিলু আর মা। সারাদিন তারা নানা বিষণ্ণতায় ডুবে থাকে। তাই কেউ এলে ভীষণ আনন্দ হয় বন্দনার। তাকে আর ছাড়তেই চায় না। ঠিক যে রকম হয়েছিল রমা মাসির বেলায়। রমা মাসিকে চোখের আড়াল করত না সে। তারপর একদিন এমন

হল যখন রমা মাসি ফিরে গেলে সে বাঁচে। শেষে রমা মাসি গেল বটে, কিন্তু নিয়ে গেল তার জীবনের সব আনন্দ, সব আলো, সব উভাস। কাল যখন দীপ্তিদি এল, তখন কী যে আনন্দ হয়েছিল বন্দনার। আজ মনে হচ্ছে, দীপ্তিদি চলে গেলেই ভাল। ওকে আর একটুও ভাল লাগছে না তার। বিধবা হয়েও মাছ-মাংস খায়, একাদশী অম্বুবাচী করে না, পুরুষদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে বেড়ায়। অতীশ কি এত সব জানে? জানে কি যে, দীপ্তিদির জন্যই তার বর আত্মহত্যা করেছিল? নিশ্চয়ই জানে না, জানলে এত মেশামেশি করত কখনও? দীপ্তিদি আজ সকালে নিজের ঘরে খুব গুনগুন করে গান গাইছিল। খুশিতে মুখখানা খুব ডগোমগো। কীসের এত আনন্দ ওর? একজন বিধবার কি এত আনন্দ করা উচিত? বিশেষ করে যে বাড়িতে এত দুঃখ, এত শোকতাপ?

৪. লাস্ট ল্যাপ

টুপি মাথায় একটা লোক চেঁচিয়ে বলছিল, লাস্ট ল্যাপ! লাস্ট ল্যাপ! কথাটা অতীশের কানে ঢুকল, কিন্তু বোধে পৌঁছোল না। শেষ ল্যাপ বলে কিছু কি আছে? সামনে অফুরান মাঠ। চুনের দাগ যেন দূর পাল্লার রেললাইনের মতো অনন্তে প্রসারিত। ইনজেকশনের ক্রিয়া অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে। তার কুঁচকিতে এখন কুমিরের কামড়। চিবিয়ে খাচ্ছে হাড়গোড়, মাংস, মজ্জা, আগুন জ্বলছে ব্যথার। আগের ল্যাপে সে ডিঙিয়েছে সুকুমার আর আজিজুলকে। তিন চার ফুট আগে দৌড়োচ্ছ গৌরাঙ্গ, আরও আগে নবেন্দু। অসম্ভব! অসম্ভব! এই দৌড়টা সে পারবে না।

কিন্তু সেই মানুষ পারে, যে কিছুতেই হার মানে না। আগের তিনটে রেস সে জিতেছে। তখন ইনজেকশনের ক্রিয়াটা ছিল, পাল্লাও কম। একশো, দুশো আর চারশো মিটার। চারশো মিটারের পর অনেকগুলো অন্য আইটেম ছিল। যত সময় গেল তত কমে গেল ওষুধের ক্রিয়া। ডাক্তার অমল দত্ত অবশ্য তাকে বলেছিলেন, এই পা নিয়ে দৌড়োবি? পাগল নাকি? তোর পায়ের অবস্থা ভাল নয়। স্ট্রেন পড়লে পারমানেন্টলি বসে যাবি।

কথাটা কানে তোলেনি সে। কাকুতি মিনতি করেছিল। ডাক্তার দত্ত একটু ভেবে বলেছিলেন, স্পোর্টসের ঠিক আগে আসিস। দিয়ে দেব।

পার্মানেন্টলি বসে যাওয়ার কথা শুনেও ভয় পায়নি অতীশ। ভয় পাওয়ার নেইও কিছু। এই দুটো পা তাকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু দুটো পাকে কী দিতে পেরেছে সে? পেটে পুষ্টিকর খাবার যায় না, যথেষ্ট বিশ্রাম নেই, যথোচিত ম্যাসাজ হয় না, এমনকী একজোড়া ভদ্রস্থ রানিং স্পাইক অবধি নেই। তবু অযত্নের দুখানা পা তার হাত ভরে দিয়েছে প্রাইজে। আর পা দুটোকে বেশি খাটাবে না অতীশ। বয়সও হচ্ছে। হাঁটাচলা বজায় থাকলে, আলু বেগুনের বোঝা বইতে পারলেই যথেষ্ট।

ধপ ধপ ধপ ধপ করে মাঠের ওপর কয়েকজোড়া ক্লান্ত ভারী পা পড়ছে, উঠছে, পড়ছে উঠছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো। পাঁচ হাজার মিটারের শেষ ল্যাপ এক মারাত্মক ব্যাপার। দীর্ঘ দৌড়ের শেষে এসে জেতার ইচ্ছে উবে যায়, দিকশূন্য ও উদভ্রান্ত লাগে, বুক দমের জন্য আকুলি ব্যাকুলি করে, হাত পা মাথা সব যেন চলে যায় ভূতের হেফাজতে। নিজেকে নিজে বলে মনে হয় না। অতীশের মাথা থেকে পায়ের তলা অবধি ঘামছে। গায়ের শার্ট ভিজে লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে। চোখ ধোঁয়া ধোঁয়া। বুদ্ধি কাজ করছে না। ধৈর্য থাকছে না, মনের জোর বলে কিছু নেই। কত দুর অবধি চলে গেছে চুনের দাগে চিহ্নিত ট্র্যাক! এই দৌড়টা মারতে পারলে সে হবে ওভার-অল চ্যাম্পিয়ন। চ্যাম্পিয়নকে আজ দেওয়া হবে একটা সাদা কালো টিভি। সেটা বেচলে হাজার বারোশো টাকা চলে আসবে হাতে। সুমিত ব্রাদার্সের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

তার অগ্রবর্তী দুজন দৌড়বাজের অবস্থাও তারই মতো। ঘাড় লটপট করছে। পা টানছে না, স্পিড বলে কিছু নেই। শুধু একটু ইচ্ছের ইনজিন টেনে নিচ্ছে তাদের।

মিউনিসিপ্যালিটির মাঠ ভাল নয়। একটা গর্তে বাঁ পাটা পড়তেই টাল খেল শরীরটা। পড়লে আর উঠতে পারবে না অতীশ। কী বলছিল লোকটা? লাস্ট ল্যাপ! সর্বনাশ! লাস্ট ল্যাপ! অতীশ কি পারবে না? ধোঁয়াটে মাথায় একটা লোকের চেহারা মনশ্চক্ষে দেখতে পেল অতীশ। না, লোকটাকে সে কখনও দেখেনি। তার ছবিও না। তবু দেখল। কোন অলিম্পিকে যেন ম্যারাথন দৌড়োচ্ছিল লোকটা। লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে মচকে গেছে পা। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তবু দৌড়ে যাচ্ছিল সে। প্রাইজের আশা ছিল না, শুধু দৌড়টা শেষ করতে চেয়েছিল। দৌড় শেষ করাই ছিল। আসল কথা। শেষ অবধি সকলের পরে সে যখন স্টেডিয়ামে ঢুকল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। স্টেডিয়ামের আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লোকটা শুধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে শেষ করছে দৌড়। সমস্ত স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়াল তার সম্মানে। করতালিতে ফেটে পড়ল চারদিক। বিজয়ী সে নয়, তবু এক অপরাজেয় মানব। কোনও মেডেলই পায়নি সে, তবু সে লক্ষ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল মানুষের আবহমানকালের সংগ্রামের ইচ্ছাকে।

পারব না? আমি পারব না? ভগবান! অতীশের সঙ্গে গৌরাঙ্গের দূরত্ব বাড়েনি। একই আছে। এখনও। কিন্তু গৌরাঙ্গর কুঁচকিতে ব্যথা নেই। দূরত্বটা থেকেই যাবে।

একটা বাঁক আসছে। অতীশ বুক ভরে একটা দম নেওয়ার চেষ্টা করল। বুক হাফরের মতো শব্দ করে উঠল হঠাৎ। দুটো পায়ে নবতর শক্তি সঞ্চার করার জন্য অতীশ তার পা দুখানার উদ্দেশে বলতে লাগল, কাম অন! কাম অন বয়েজ! কাম অন...

একটা ছায়ার মতো গৌরাঙ্গকে নিজের পাশাপাশি দেখতে পেল অতীশ। তারপর ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সামনে শুধু নবেন্দু।

আর কতখানি বাকি? চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না অতীশ। চারপাশটা কেমন যেন ছায়া-ছায়া, যেন ওয়াশের ছবির মতো আবছা! চোখে নেমে আসছে কপালের অবিরল ঘাম। একটা তীব্র, অসহনীয় ব্যথার গর্জন শুনতে পাচ্ছে সে। এ ছাড়া শরীর-বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে তার। শুধু টেনে নিচ্ছে নিজেকে, হিঁচড়ে ছেড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রোগ ও জরাগ্রস্ত মানুষ যেভাবে প্রায় শবদেহের মতো নিজের অস্তিত্বকে আমৃত্যু টানে। কিন্তু শরীর কীসের জন্য, যদি তার কাছ থেকে আদায় না করা যায় অস্তিত্বের সুফল?

বহু দূরে সে ট্র্যাকের ওপর একটা টানা আবছা লাল ফিতে আর কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেল। ওই কি শেষ সীমানা? নবেন্দু এখনও প্রায় চার পাঁচ ফুট আগে। এতটা গ্যাপ! অসম্ভব! অসম্ভব!

কে যেন অতীশের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, পারব! পারতেই হবে। কাম অন বয়েজ। কাম অন...

মাধ্যাকর্ষণ বড় প্রবল। তাকে টেনে নিতে চাইছে ভূমিশয্যা। তার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে জলে ডুব দিয়ে বসে থাকতে। ইচ্ছে করছে লেবুপাতা দিয়ে মাখা পান্তাভাত খেতে। তার ইচ্ছে করছে পৃথিবীর সব প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে।

সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য? জাগল অতীশ। দেখল। নবেন্দু কি আরও একটু এগিয়ে গেছে? নবেন্দুকে না সে আগেরবার অনেক পিছনে ফেলে জিতেছিল?

কাম অন বয়েজ। কাম অন।

দুটো পা লোহার মতো ভারী। শব্দ হচ্ছে ধপ ধপ। যেন হাতির পা। গোদা পা। তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না তারা।

নবেন্দু একবার ঘাড় ঘোরাল। তাকে দেখে নিল।

ভূল! মারাত্মক ভুল। ঘাড় ঘোরাতে নেই কখনও। অন্তত শেষ ল্যাপে নয়। দুটো কদম যোগ করে নিল অতীশ। গ্যাপ কমে গেছে। আর একটু... আর একটু...

গ্যাপ কমছে। কমছে।

কাম অন বয়েজ...।

শরীরের একটা উথাল পাথাল তুলল অতীশ। দৌড়োচ্ছ না, যেন নিজেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে সামনে। ঢেউয়ের মতো।

নবেন্দু দ্বিতীয় ভুল করল, আবার ফিরে তাকিয়ে। তার চোখে বিস্ময়। হাঁটুতে হাঁটুতে লেগে একবার ভারসাম্য হারাতে হারাতে সোজা হল নবেন্দু।

অতীশ মনে মনে বলল, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।

একটা ঝটকায় তারা পাশাপাশি। কারা চিৎকার করছে মাঠের বাইরে থেকে? কাদের মিলিত কণ্ঠ জয়ধ্বনির মতো তার নাম ধরে ডাকছে, অতীশ! অতীশ!

শেষ কয়েক পা অতীশ দৌড়োল একশো মিটারের দৌড়ের মতো। প্রাণ বাজি রেখে।

লাল ফিতে বুক দিয়ে ছুঁয়ে সে একবার দুহাত ওপরে তুলবার চেষ্টা করল। তারপর সেই দুই হাতে একটা অবলম্বন খুঁজতে খুঁজতে চোখ ভরা অন্ধকার নিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাঠে। সে জিতেছে!

চোখে মুখে জলের ঝাপটা খেয়ে দু মিনিট বাদে তার জ্ঞান ফিরল। আরও দশ মিনিট বাদে ভিক্টরি স্ট্যান্ডে উঠল সে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে। চারদিক ফেটে পড়ছে উল্লাসে। সে জানে, সে অলিম্পিক জেতেনি, বিশ্বরেকর্ড করেনি। ভারতবর্ষের এক ছোট্ট অখ্যাত শহরে জেলাওয়ারি একটা প্রতিযোগিতায় জিতেছে মাত্র। তার নাম ছোট্ট করেও বেরোবে না খবরের কাগজে। তার এই কৃতিত্বের কথা দর্শকরা দু দিন বাদেই ভুলে যাবে। হয়তো এই জয়ের দাম দিতে চিরকালের মতো বসে যাবে তার ডান পা। তবু নিজের ভিতরে সে এক নবীকরণ টের পেল। বারবার নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে তার এই ছোট বেঁচে থাকা যে বড় নিরর্থক হয়ে যায়!

.

হর্ষধ্বনি ও হাততালি, পিঠ চাপড়ানি আর হ্যান্ডশেক এ সবই অতি উত্তেজক জিনিস। তার চেয়েও মারাত্মক কিশোরী ও যুবতীদের চোখে ক্ষণেকের বিহ্বল ও সম্মোহিত চাহনি। যদিও এসবই অস্থায়ী, তবু সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারে না অতীশ। এই খেলার মাঠ থেকেই তার চোখের সামনে কতগুলো প্রেম হল, তাদের বেশ কয়েকটা বিয়ে অবধি গড়িয়ে গেল। মানুষ যখন হঠাৎ করে লাইমলাইটে চলে আসে তখন সাবধান না হলে মুশকিল। এ সবই অতীশ জানে। মাত্র এক বছর আগে এই মাঠেই এরকমই স্পোর্টসের দিনে শিখা তার প্রেমে পড়েছিল। ভি আই পিদের জন্য সাজানো চেয়ারে বসে হাঁ করে তার দৌড় দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে গেল, বিবশ হয়ে পড়ল। তারপরই ওদের কাজের মেয়ে ময়নার মারফত চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল অতীশের কাছে। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এখানে সেখানে দেখা করতে বলত। অতুলবাবুর মেয়ে বলে কথা, তাকে অপমান করলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তার ঠিক কী? তাই দু একটা চিঠির জবাব

ময়নার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল অতীশ। তাতে খুব বিনয়ের সঙ্গে সে জানিয়েছিল যে, সে মোটেই শিখার উপযুক্ত নয়। সে অত্যন্ত গরিব ও নাচার. ইত্যাদি। দেখা-সাক্ষাতেও এসব কথাই সে বলত। কিন্তু শিখার তখন জর-বিকারের মতো অবস্থা। দুনিয়া এক দিকে, অতীশ অন্য দিকে। শিখা তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। অতীশ পালিয়েছিল ঠিকই, তবে শিখাকে নিয়ে নয়, শিখার হাত থেকে। হাওড়ার কাছে একটা গ্রামে তার মামার বাড়িতে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। বাঁচোয়া এই যে, খেলার মাঠের এইসব সম্মোহন আর বিহ্বলতা বেশিক্ষণ থাকে না। বড় অস্থায়ী। চিতু নামে ডাক্তারি পাশ করা একটি ছেলে শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলল। বেঁচে গেল অতীশ। তবু তার সেই অ্যাকসিডেন্টটার কথা খুব মনে হয়। চালপট্টিতে শিখার গাড়ির ধাক্কায় সে চিতপটাং হয়ে গিয়েছিল। অল্পের জন্য বড় চোট হয়নি। সেদিনকার আর সব চোট তুচ্ছ মনে হয়, যখন মনে পড়ে, সেদিন শিখা তাকে চিনতে পারেনি।

দুটো একটা এরকম কেস কাটিয়ে উঠেছে অতীশ। আজ সারা সকাল আর এক জোড়া মুগ্ধ ও বিহ্বল চোখ তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে। এ চোখজোড়া দীপ্তির। অতীশের চেয়ে অন্তত পাঁচ সাত বছরের বড় এবং বিধবা এবং সন্তানের মা। আজকাল অবশ্য ওসব কেউ মানছে না। সব দিকেই শুধু বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও মাগান। কিন্তু বাঁধ ভাঙার দুটো বাধা আছে। মার্কসবাদের পাঠশালায় নৈতিকতার একটা শিক্ষা ছিল। ফস্টিনস্টি জিনিসটা মার্কসবাদে গৃহীত নয়। অন্য দিকে তার পারিবারিক ধারাটাও ওরকমই কিছু একটা তার মধ্যে সঞ্চারিত করে থাকবে।

রিক্সা চালানোটা যে একটা ভীষণ বীরত্বের ব্যাপার এবং অতীশ রিক্সা চালিয়ে যে এই অন্তঃসারশূন্য সভ্যতাকে চাবুক মারছে, সভ্যতার মুখোশ টেনে খুলে ফেলছে এসব শক্ত কথা তার কস্মিনকালেও মনে আসেনি। তার বাড়ির কেউ পছন্দ না করলেও অতীশ রিক্সা চালিয়েছে বসে না থেকে কিছু একটা করার তাগিদে। সেটা যে এরকম একটা মহান ব্যাপার তা দীপ্তিই আজ তাকে শিখিয়েছে। শহর দেখতে দেখতে তাকে একবার দীপ্তির সঙ্গে শহরের সবচেয়ে ভাল রেস্তোরাঁয় বসে গল্পও করতে হয়েছে। তখন দুখানা চোখের

সব সম্মোহন উজাড় করে দিয়েছে দীপ্তি। কলকাতার মেয়ে তো, ওদের সব ব্যাপারে তাড়াহুড়া। মোটে সময় দিতে চায় না কিছুতে।

বলল, আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুন। ওখানে অনেক স্কোপ। আমার ফ্ল্যাটটাও মস্ত বড়, দেড় হাজার স্কোয়ার ফুট। স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।

আর একটা শিথিল মুহূর্ত এল দুপুরবেলায় নির্জন নদীর ধারে কাছারির ঘাটে দাঁড়িয়ে। বটের ঝিরঝিরে ছয়া, নীচে ঘাট, ঘাটে ডিঙি নৌকো বাঁধা, জলের কুচি কুচি ঢেউয়ে রোদের হিলিবিলি। খপ করে তার হাতটা নিজের নরম কবোষ্ণ হাতে ধরে ফেলে দীপ্তি বলল, আপনাকে আমার এত ভাল লাগছে কেন বলুন তো। এই শোনন, এখন থেকে তোমাকে আমি তুমি বলব। তুমিও বলবে তো!

মফস্বলি মাথায় এসব সহজে ঢুকতে চায় না। এ যেন সিনেমা বা উপন্যাস। সত্যি নয়। ভদ্রতাবশে হাতটা ছাড়াতেও পারেনি অতীশ। খেয়ার মাঝি বুড়ো মৈনুদ্দিন তার খোড়ো ঘরের দরজায় বসে দৃশ্যটা দেখছিল।

দীপ্তি ধরা গলায় বলল, আমার কিছুই অভাব নেই, জানো? আমার হাজব্যান্ড প্রচুর রোজগার। করত। ব্যবসা ছিল, শেয়ার কেনার নেশাও ছিল। ব্যাঙ্কে আমার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পচছে। বছরে কত টাকা ডিভিডেন্ড পাই ভাবতেও পারবে না। অভাব কীসের জানো? আমার ভালবাসার একটা লোক নেই। এমন একজন যার জন্য প্রাণপাত করে কিছু করতে ইচ্ছে করে। যাকে ঘিরে লতিয়ে ওঠা যায়। মেয়েদের তো লতার সঙ্গেই তুলনা করা হয়, না?

মৈনুদ্দিন ঠিক এ সময়টায় গলা খাঁকারি দিয়েছিল। গলার দোষ হতে পারে, আওয়াজ দেওয়াও হতে পারে।

চলো, নৌকোয় একটু বেড়িয়ে আসি। যাবে?

তা গেল অতীশ। মরা নদীতে চর পড়ে গেছে অনেকটা। ওপাশের সরু ধারাটায় কিছু গভীরতা আছে, এপাশে হাঁটুজল। মৈনুদ্দিন চরটা পাক মেরে ওপাশের শ্মশানঘাট অবধি নিয়ে গেল। দীপ্তি মুগ্ধ, স্বপ্নাতুর। ডিঙির হেলদোলে বারবার মুখোমুখি বসা অতীশের হাত চেপে ধরছিল। ওর গা থেকে নানা ধরনের সুগন্ধি আসছিল তখন। অতীশ হলফ করে বলতে পারবে না যে, তার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু ভিতরে হচ্ছিল অন্যরকম। সেখানে যেন তুফানে পড়া নৌকো বাঁচাতে সামাল সামাল বলে গলদঘর্ম হচ্ছে দুই পাকা মাঝি। মার্কস আর রাখাল ভট্টাচার্য।

কাছারির ঘাটে যখন এসে নৌকো ভিড়ল তখন দীপ্তি একটু একটু মাতাল। অতীশের হাত জড়িয়ে ধরে টলতে টলতে উঠে এল ভাঙা পাড় বেয়ে। বটগাঙ্কে ঝিরঝিরে ছায়ায় তার দুখানা চোখ তুলে শুভদৃষ্টির কনের মতো অতীশের দিকে স্বপ্নাতুর চেখে বলল, কী ভাল লাগল, না?

অতীশ ভেবেছিল, এই অস্থায়ী সম্মোহনটা কেটে যাবে। সে রিক্সাটা টেনে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, এবার যেতে হবে।

দীপ্তি মাথা নেড়ে মিষ্টি হেসে বলল, না। এখনই না। একটু বোসস তো আমার পাশে।

অতীশ একটু গাঁইগুই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত ধরে টানলে সে কী করতে পারে? রিক্সা বড় ঘেঁস জায়গা। দুজনকে খুব চেপে ধরল একসঙ্গে।

দীপ্তি একটু হাসির ঝিলিক তুলে তার দিকে তাকাল। তাকাতেও পারে বটে মহিলা। তাকিয়ে তাকিয়েই খুনখারাবি করে দিতে পারে। অতীশ তো আর পাথর নয়। মার্কস এবং রাখাল ভট্টাচার্য দুজনেই সাধ্যমতো লড়েছেন। কিন্তু তাঁরা বুড়ো মানুষ, কটাক্ষের ধারে কচুকাটা হওয়ার জোগাড়। দুই বুড়ো হেদিয়ে পড়েছেন তখন। আর সেইসময়ে ডাইনির শ্বাসের মতো সর্পিল সব অদ্ভুত বাতাস আসছিল নদীর জল ছুঁয়ে। আর তখন রোদের আলোয় সঞ্চারিত হচ্ছিল ভুতুড়ে রং। আর দীপ্তির গা থেকে মদির এক গন্ধ আসছিল।

প্রকাশ্য দিবালোকে, দ্বিপ্রহরে, লোকলজ্জা ভুলে বসে ছিল অতীশ। ভগবানের দিব্যি, তার খারাপ লাগছিল না। ওইভাবে বসে থাকাটার কোনও কারণ নেই, প্রয়োজন নেই, তবু কেন যে ভাল লাগছিল তা কে বলবে?

কাছাকাছি মুখ, দীপ্তি তার গালে শ্বাস ফেলে বলল, তোমার এত গুণ, কেন যে মফস্বল শহরে পড়ে আছ! এখানে তোমার কিছু হবে না। তোমার কলকাতায় যাওয়া উচিত।

কলকাতায় গেলে তার কী হবে তা অতীশ বুঝতে পারল না। তবে সে প্রতিবাদও করল না। মার্কসবাদের শিক্ষা তাকে টাকাওলা লোকদের ঘৃণা করতেই প্ররোচিত করেছে। কিন্তু কার্যত তা পেরে ওঠেনি অতীশ। বরং টাকাওলা মানুষজনকে সে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই একটু সমীহ করতে থাকে। দীপ্তির প্রতিও তার সমীহের ভাবটা এসে পড়ছিল। তার সঙ্গে ছিল একটা শরীরী উত্তেজনা। আরও ছিল, একটু মোহ- স ভাব। আরও কিছু থাকতে পারে। অত জটিল, সূক্ষ্ম ব্যাপার সে বুঝতে পারে না।

তুমি আমার কথাটার এখনও জবাব দাওনি।

অতীশ ভাবছিল। বটের ছায়ায় রিক্সার সিটে দীপ্তির পাশে বসে থেকে পরিষ্কার মাথায় কিছু ভাবা অসম্ভব। তবু প্রস্তাবটা তার মন্দ লাগেনি। কলকাতায় গেলে কী হবে তা সে জানে না। তবে অনেক সম্ভাবনা খুলে যেতে পারে। সে বলল, ভেবে দেখব।

বেশি ভাবতে গেলে কিছু হয় না, জানো? এটা ভাববার যুগ নয়। কুইক ডিসিশনের যুগ। চটপট ঠিক করে ফেলতে হয়। ভাবতে গেলে করাটা আর হয়ে ওঠে না।

মাত্র কাল রাতে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয়। আর আজ সকালের মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের আলাপে যে এতটা হতে পারে তা কী করে বিশ্বাস করবে অতীশ? কুইক ডিসিশনের যুগই হবে এটা। মফস্বল শহরে তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যুগটা কেমন তা বুঝতে পারেনি এতদিন। যুগটা যদি এতটাই এগিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে এত পিছন থেকে দৌড়ে যুগটাকে কি ধরতে পারবে সে?

আজ তার মাথা কিছুটা বিভ্রান্ত। কোন এক রহস্যময় কারণে বয়সে বড়, বিধবা, সন্তানবতী এক মহিলা তাকে টানছে। বড় টান।

বিশু ভ্যানগাড়িটা ডেকে নিয়ে এল। বলল, চলো গুরু, মাল গস্ত করতে হবে।

মাঠটা ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে আসছে। রোদ মরে সন্ধে নামতে আর দেরি নেই। বিস্তর গাড়ি জড়ো হয়েছিল। এক একটা গাড়িতে ভি আই পিরা একে একে মাঠ ছেড়ে যাচ্ছে। ম্যারাপের একটু পশ্চিমে আতা গাছটার তলায় পায়ের কাছে সাজানো চারটে ব্রিফকেস, একটা টিভি বাক্স আর হাতে একটা মস্ত খাবারের বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতীশ। হাততালি, হর্ষধ্বনি থেমে গেছে, বিহ্বল ও সম্মোহিত যুবতী ও কিশোরীরা রওনা হয়ে গেছে যে যার বাড়িতে। একটু ফেক লাগছে নিজেকে এখন। সে বলল, চল।

বিশু মাল তুলে ফেলল গাড়িতে। বলল, কুঁচকির খবর কি?

দড়ির মতো ফুলে আছে। ইলেকট্রিক শকের মতো ব্যথা।

পা-টা কি ভোগে চলে যাবে গুরু?

যায় যাবে। উদাস গলায় বলল অতীশ।

আফসোস কি বাত।

ভ্যানগাড়ির পেছনদিকে দুজনে দুধারে পা ঝুলিয়ে বসেছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় ভ্যানগাড়ি ঝকাং ঝকাং করে লাফাচ্ছে। তাতে কুঁচকির ব্যথা ঝিলিক মেরে উঠছে মাথা অবধি।

মেয়েছেলেটা কে গুরু?

কোন মেয়েছেলেটা?

যাকে আজ খুব ঘোরালে।

ব্যথায় মুখটা একটু বিকৃত করে অতীশ বলল, সওয়ারি।

ফেস কাটিংটা ভাল। বলে বিশু চুপ করে গেল।

ছোট শহর, এখানে সবাই সব জেনে যায়। লুকোছাপা করার উপায় থাকে না। কলকাতা এরকম নয়। যা খুশি করো, কেউ গায়ে মাখবে না। অতীশ একটু গুম মেরে রইল। ফেস কাটিংটা ভাল–একথা বলার মানে কী?

সুমিত ব্রাদার্স ভাল পার্টি। মাল গস্ত করে দু হাজার টাকা পেয়ে গেল অতীশ। সকালে বেগুনের দাম তুলেছে পাইকারের কাছ থেকে। আজকের দিনটা ভালই। কতটা ভাল তার আরও হিসেব নিকেশ আছে।

সবটা টাকার হিসেব তো নয়। আজকের দিনটা যেন একটা মাল্টি ভিটামিন ক্যাপসুল। একটাই দিন, কিন্তু তার মধ্যে যেন অনেকগুলো দিনের ঘটনাবলি কেউ ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অতীশের মাথা এত নিতে পারছে না। একটু টলমল করছে। শুধু বারবার বিশুর কথাটা ঘুরে ফিরে টোকা মারছে মাথায়, ফেস কাটিংটা ভাল। তার মানে কি, তাকে আর দীপ্তিকে নিয়ে গালগল্প ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে? ফেস কাটিংটা ভাল এ কথার ভিতর কি চাপা ইঙ্গিত আছে? ও কি বলতে চাইছে; চালিয়ে যাও গুরু, মালটা খারাপ নয়?

খাবারের বাক্সটা দুজনে ভাগাভাগি করে খেল ইস্কুলের ফাঁকা মাঠে জ্যোৎস্নায় বসে। দুটো চিকেন স্যান্ডউইচ, দুটো সন্দেশ, একটা ফিস ফ্রাই আর দুটো কলা। সব শেষে যখন কলাটা খাচ্ছে দুজনে সেই সময়ে পর পর দুটো বোমার শব্দ হল কাছেপিঠে।

বিশু কান খাড়া করে শুনে বলল, আজ লাগবে।

অতীশ শুধু বলল, হুঁ।

কলার খোসাটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশু বলল, ল্যাংড়া আজ এন্ট্রি নেবে। বুঝলে! আজ বিকেলে পুলিশ পিকেট উঠে গেছে। এই মওকা।

৫. চোখের বিহ্বল দৃষ্টি

চোখের ওই বিহ্বল দৃষ্টি, মুখের ওই সম্মোহিত ভাব এসবই চেনে বন্দনা। কী ভাবে চেনে তা সে বলতে পারতে না। হয়তো রমা মাসির মুখেও এরকম দেখে থাকবে দুপুরে যখন দীপ্তিকে নামিয়ে দিয়ে গেল। তীশ তখনও দোতলার বারান্দায় রেলিঙের পাশে শানের ওপর পাথরের মতো বসে ছিল বন্দনা। অতীশ একবার ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বারান্দার দিকে তাকাল। তাকে দেখতে পায়নি। তারপর রিক্সার মুখ ঘুরিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল। দীপ্তি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে। রোদে ঘুরে মুখখানা লাল। কপালে একটু ঘাম। কিন্তু ক্লান্তি নয়, সারা শরীর যেন ডগমগ করছে আনন্দে। তখনই বন্দনা দীপ্তির চোখে সেই বিহ্বলতা দেখতে পেল।

বুকের ভিতরটা যেন নিবে গেল বন্দনার। বিকল হয়ে গেল হাত পা। স্থবির হয়ে গেল শরীর।

কী রে এখানে বসে আছিস যে!

দীপ্তি যে হাসিটা হাসল সেই হাসিই অনেক খবর দিয়ে দিল বন্দনাকে। সে বলল, এমনিই।

আজ কত ঘুরলাম! তুই সঙ্গে গেলে বেশ হত!

বন্দনা অবাক হয়ে বলল, আমি সঙ্গে গেলে…?

কথাটা শেষ করল না সে। একটা প্রশ্নের মতো ঝুলিয়ে রাখল। অতীশকে সামনে পেলে সে ওর জামা খিমচে ধরত এখন, বলত, তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক! বিচ্ছিরি লোক। বিচ্ছিরি লোক।

দীপ্তি নিজের ঘরে পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে গুনগুন করে গান গাইছিল। আর বারান্দায় বসে অসহায়ের মতো কান্না সামলানোর চেষ্টা করছিল বন্দনা। পৃথিবীটা যে কেন এত খারাপ!

পিছনের বাগানে গাছতলায় তার পুতুলের সংসারে কতবার মিছে নেমন্তন্ন খেতে এসেছে একটি কিশোর। যার চোখ মুখ ছিল ভারী সহজ ও সরল, দুটো চোখে ছিল বিস্ময়ভরা লাজুক চাহনি। তখন কোঁচা দুলিয়ে খাটো ধুতি পরত অতীশ, গায়ে ছিল জামা। সংকোচ ছিল, লজ্জা ছিল। কত শাসন করেছে তাকে বন্দনা। বাগানে তখন অনেক বেশি গাছপালা, ঝোপঝাড় ছিল। অনেকে এসে জুটত তখন। রাজ্যের ছেলেমেয়ে মিলে চোর-চোর খেলত। তার মনে আছে অতীশকে একবার। ধরে এনে চোর সাজিয়েছিল তারা। অতীশের সে কী হাসি। কাউকেই সে ছুঁতে পারছিল না। দৌড়ে দৌড়ে হয়রান হল। বন্দনার তখন মায়া হয়েছিল। কামিনী ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সে হাত বাড়িয়ে বলল, এই নাও, আমাকে ছুঁয়ে দাও তো অতীশদা। অতীশ চমকে উঠে বলে, তাই কি হয় খুকি? তুমি বড় বাড়ির মেয়ে, তুমি কেন চোর হবে? বন্দনা তখন দৌড়ে গিয়ে। অতীশকে ছুঁয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, এইবার? বন্দনা চোর সাজল, কিন্তু আর সবাই পালালেও অতীশ এসে সামনে দাঁড়াল বোকার মতো, এই নাও খুকি, আমাকে ছুঁয়ে দাও তো! এত দৌড়ঝাঁপ তোমার সহ্য হবে না। এত রাগ হয়েছিল তখন অতীশের ওপর।

আজ চোখে জল আসতে চায় কেন যে!

তার বাবার পিছু পিছু অতীশ টুকটুক করে শান্ত পায়ে হেঁটে আসত। বাবার পাশে চুপ করে বসে পুজো করা দেখত। কখনও ঘুরে ঘুরে তাদের এঘর ওঘরে সাজানো জিনিস দেখে বেড়াত। মা কখনও কিছু খাবার দিলে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠত খুশিতে। কত যত্ন করে খেত! খিদে ছিল, কিন্তু লোভ ছিল না কখনও। বন্দনা যখন গান গাইতে শুরু করে তখন তো অতীশ বেশ বড়টি হয়েছে। চুপ করে বসে গান শুনত। একটু আধটু তবলা বাজাতে শিখেছিল, ঠেকা দিত।

তাদের কত ফাইফরমাশ যে খেটে দিত অতীশ তার ইয়ত্তা নেই। ওই উঁচু উঁচু নারকোল গাছে উঠে কাঁদি কাঁদি নারকোল পেড়ে দিত আর বন্দনার তখন কী ভয় করত। অত উঁচু থেকে যদি পড়ে যায়! সে চিৎকার করতে থাকত, ও অতীশদা! নেমে এসো না! পড়ে যাবে যে!

না না পড়ব না খুকি। আমি কত গাছ বেয়ে বেড়াই।

একদিন বন্দনা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কেন আমাদের এত ফাইফরমাশ খাটো?

অতীশ অবাক হয়ে বলেছিল, তাতে কী? তোমরা ব্রাহ্মণ জমিদার! আমাদের অন্নদাতা, মনিব।

এমন ভারিক্কি চালে বলেছিল যে বন্দনা হেসে বাঁচে না।

আজ হাসি পায় না বন্দনার। একটুও হাসি পায় না।

খাওয়ার পর নিজের ঘরে চুপ করে শুয়েছিল বন্দনা। শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে। মনটা অন্ধকার।

দীপ্তি এসে বলল, কী রে ঘুমোচ্ছিস?

না দীপ্তিদি, দুপুরে আমি ঘুমোত পারি না।

তা হলে বসে একটু গল্প করি।

মুখে জোর করে হাসি টেনে উঠে বসল বন্দনা।

ঘরে রোদের কয়েকটা চৌখুপি এসে মেয়ের ওপর পড়ে আছে। পায়রা ডাকছে। কাকের ডাকে খাঁ খাঁ হয়ে যাচ্ছে অপরাহ্ণ।

দীপ্তি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, ছেলেটা এত ইন্টারেস্টিং যে আমি ঠিক করেছি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব।

বন্দনা অবাক হয়ে বলে, নিয়ে যাবে? নিয়ে কী করবে দীপ্তিদি?

কী করব তা এখনও ঠিক করিনি। ছেলেটার অনেক গুণ। আজ শুনলাম ও নাকি ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, কল সারাইয়ের কাজ, মোটর মেকানিকের কাজ সবই একটু আধটু জানে। টাইপ-শর্টহ্যান্ডও শিখেছিল। এত শিখেও মফস্বলে ওর তো কিছু হল না। ভাবছি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওকে একটা কোনও ট্রেনিং দেওয়া। এখানে তো কোনও স্কোপ নেই। খেটে মরবে, পেট ভরবে না।

শুধু পরোপকার? আর কিছু নয়? বন্দনা বড় বড় চোখ করে দীপ্তির মুখটা দেখছিল। সেই মুখে না-বলা অনেক ভাব খেলা করছে। বারবার যেন নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পাচ্ছে। এ লক্ষণ সে চেনে।

দীপ্তি বলল, অমল তো আমার কোনও অভাব রেখে যায়নি। ভাবছি, যদি একটা ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি তবে টাকাটা সার্থক হবে।

আজ তোমরা কোথায় কোথায় গিয়েছিলে দীপ্তিদি?

ওঃ, আজ সারা শহরটা পাগলের মতো ঘুরেছি। নদীর ধারটা দারুণ ভাল। নৌকোতেও চড়লাম একটু।

বন্দনা একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। সেই শ্বাসটা তার বুকের মধ্যে একটু ব্যথা হয়ে থর্ম ধরে রইল।

তুমি কি তোমার সঙ্গেই অতীশদাকে নিয়ে যাচ্ছ?

না। আমি কাল ফিরে যাব। অতীশ যাবে আরও এক মাস বাদে। একটু গুছিয়ে নিয়ে যাবে।

খুব সরলভাবে বন্দনা জিজ্ঞেস করল, অতীশদা কোথায় থাকবে?

কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে দীপ্তি বলল, এখনও ঠিক করিনি। বন্ডেল রোডে তো আমার আরও একটা ফ্ল্যাট পড়ে আছে। ভাড়া দিইনি। ওখানে অমলের কম্পিউটার আর আরও সব কী যেন আছে। তালাবন্ধ পড়ে থাকে। সেখানেই থাকতে পারবে।

তোমার অনেক টাকা, না দীপ্তিদি?

দীপ্তি একটু উদাস হয়ে বলল, টাকা! তা হয়তো আছে। অমলের তো টাকার নেশা ছিল। কিন্তু টাকা দিয়ে কী হবে বল, মানুষটাই তো থাকল না।

মানুষকে ধরে রাখা যে কত কঠিন তা বন্দনার মতো আর কে জানে? কেউ মরে যায়, কেউ চলে যায়। কী যে একা আর ফাঁকা লাগে তার! চোখ ভরে জল আসছিল তার।

গল্প করতে এসেছিল দীপ্তি। কিন্তু কেন যেন তাল কেটে গেল। জমল না। যাই রে, কাল সকালেই গাড়ি, গুছিয়ে নিই। বলে দীপ্তি হঠাৎ উঠে গেল।

বিকেলে তার মা গলদঘর্ম হয়ে একটা চিঠির মুসাবিদা করছিল। লেখা-টেখার অভ্যাস নেই। বন্দনাকে ডেকে বলল, ওরে দেখ তো, ভুলভাল লিখেছি কি না। কতকাল কিছু লিখিনি, বানানই ভুলে গেছি। একটু দেখে দে তো।

বন্দনা লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি বাবাকে লিখছ, আমার কি সে চিঠি পড়া উচিত?

আহা, এ কি আর সেই চিঠি নাকি? এ চিঠির মধ্যে গোপন কথা আর কী থাকবে! পড়ে দেখ।

বন্দনা পড়ল। বেশি বড় চিঠি নয়। সম্বোধনে এখনও শ্রীচরণেষু লিখতে ভোলেনি মা। লিখেছে, তোমার বাড়িতে তুমি আসতে চাও আমি বারণ করার কে। বরং তোমার বাড়িতে আমিই তো অনধিকারীর মতো বাস করছি। আমি অন্য বাড়ি দেখছি, শিগগিরই ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে যাব। তোমার পথে আর কোনও কাঁটা থাকবে না। শাওলরাম মাড়োয়ারি এ বাড়ি কিনতে চাইছে। যদি তাকে বাড়ি বিক্রি করে তা হলে তোমার বড় দুটি ছেলে-মেয়ের জন্য কিছু রেখো। ওদের তো ভবিষ্যৎ আছে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে আবার চোখে জল এল বন্দনার। তার বাবা আর মায়ের মধ্যে কত ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, এখন কত দূরের হয়ে গেছে দুজনে। কেন যে এমন হয়?

ভুলভাল নেই তো।

না মা।

পাঠাব এ চিঠি?

পাঠাও।

পশ্চিমে দিগন্তে যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল আজ তখন ছাদের ওপর থেকে আকুল চোখে চেয়ে ছিল বন্দনা। তার মনে হচ্ছিল এই যে সূর্য অস্ত গেল আজ, আর উঠবে না কখনও। এর পর থেকে অনন্ত রাত্রি। শুধু অন্ধকার।

সন্ধের অন্ধকার যখন বিশাল পাখা মেলে অতিকায় এক কালো পাখির মতো নেমে আসছে, যখন গাছে গাছে পাখিদের তীব্র কলরব, পায়রারা ঝটপট করে নেমে আসছে ছাদে, ঠিক তখনই দু দুটো বোমা ফাটল পরপর।

আশ্চর্য এই-আজ ওই বিকট শব্দে একটুও চমকাল না বন্দনা। তার কোনও ভয় করল না। বরং ছাদ থেকে ঝুঁকে সে দেখার চেষ্টা করছিল, বোমা দুটো কোথায় ফাটল। বাগানের পিছন দিকে ধোঁয়া উঠছে নাকি?

পিছনের বাগানের একটা ঝোপ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল অবু। ওপরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, এই বন্দনা।

কী রে?

ঘরে যা। ল্যাংড়া অ্যাটাক করছে।

তার মানে?

ঘরে পালা।

বন্দনা একটু হাসল। বলল, এই তোর সাহস?

আমি যাচ্ছি খবর দিতে। ঘরে যা।

বন্দনা ঘরে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। দেওয়ালের ওপাশে গলিতে একটা দৌড়োদৌড়ি হচ্ছে। কে যেন ঢিল মেরে ল্যাম্প পোস্টের বালব ভেঙে দিল। অবু দৌড়ে চলে গেল সদরের দিকে। বাইরে থেকে আরও দুটো বোমা এসে পড়ল পিছনের বাগানে। বাইরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, এই শালা, জানে মেরে দেব..

ধীরে, ধীরে সন্ধ্যার ভারী বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। ছাদ থেকেই সে শুনতে পেল, তাদের দোতলায় দুড়দাড় করে জানালা দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মা চিৎকার করল, ওরে বাহাদুর! বিলু! বিলু কোথায়?

বিলু নীচের ঘরে আছে মা। পড়ছে।

আর বন্দনা?

দেখতে পাইনি।

সর্বনাশ! দেখ কোথায় গেল রোগা মেয়েটা!

দীপ্তিদি তার ঘর থেকে বেরোল বোধহয়। আতঙ্কিত গলায় বলল, এ জায়গায় তোমবা কেমন করে থাকো মামি! রোজ এরকম হয় নাকি?

আর বোলো না বাছা। কী যে ষন্ডামি-গুণ্ডামি শুরু হয়েছে আজকাল। ভয়ে মরি। বন্দনা কি তোমার ঘরে?

না তো মামি!

তা হলে কোথায় গেল?

ছাদে যায়নি তো?

বন্দনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখন তাকে ঘরে যেতে হবে। ঘরে যেতে তার একটুও ইচ্ছে করছে না। জানালা দরজা বন্ধ করে দম চেপে থাকা তার পক্ষে এখন অসম্ভব। সে মরেই যাবে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আজ কী তিথি জানে না সে। মস্ত চাঁদ দেখে মনে হয়, পূর্ণিমার কাছাকাছি। এখন কি ঘরে যেতে ইচ্ছে করে?

বাহাদুরের পায়ের শব্দ উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। বন্দনার আর ছেলেমানুষির বয়স নেই। তবু সে হঠাৎ ঘদের দক্ষিণ কোণে রাখা আলকাতরার পিপেটার পিছনে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল। বাহাদুর ছাদে এসে চারদিকটা দেখে নিয়ে ফের দৌড়ে নীচে চলে গেল।

না মা, ছাদে তো দিদিমণি নেই!

ওমা! কী সব্বোনেশে কথা! মেয়েটা তা হলে গেল কোথায়?

দীপ্তি বলল, অমন অস্থির হোয়ো না মামি, আমি দেখছি। কোনও বান্ধবীর বাড়িতে যায়নি তো!

আমাকে না বলে তো কোথাও যায় না!

পিপের আড়াল থেকে উঠে রেলিঙে ফের ভর দিয়ে দাঁড়ায় বন্দনা। শালটা আনেনি। তার শীত করছে। ঠাণ্ডা লাগবে কি? লাগুক! তার একটুও আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

শাওলরাম মাড়োয়ারি এ বাড়ির দাম দিতে চেয়েছে চৌদ্দ লাখ টাকা। চৌদ্দ লাখ শুনে মা সে কী খুশি! শাওলরামের সামনেই বলে ফেলল, আমি রাজি আছি শাওলরামজি। আপনি ব্যবস্থা করুন। উনি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আমাকে দিয়ে রেখেছেন।

কথাটা সত্যি। বাবা চলে যাওয়ার পর তার খোলা দেরাজে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা পাওয়া গিয়েছিল। তার মায়ের বা তাদের যেন কষ্ট না হয় তার জন্য তার ভাল বাবা সর্বই প্রায় সঁপে দিয়ে গিয়েছিল মায়ের হাতে।

বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা আগেই হয়ে যেত। কিন্তু মদনকাকা শাওলরামের দর শুনে মাকে এসে বলল, বউদি, আপনার কি মাথাটা খারাপ হল?

কেন মদন, দরটা তত খারাপ নয়। চৌদ্দ লাখ তো অনেক টাকা!

এ বাড়ির চৌহদ্দির মাপ চার বিঘার ওপর, পাঁচ বিঘার কাছাকাছি। এখন শহরের এ জায়গায় লাখ টাকা করে কাঠা যাচ্ছে। শুধু জমির দামই তো কোটি টাকার কাছাকাছি!

শুনে মার চোখ কপালে উঠল, বলো কি মদন? এক কোটি?

বাড়ির দামটা ধরলে আরও দশ লাখ উঠবে। বাড়ির দাম বেশিই হত। কিন্তু পুরনো বাড়ি শাওলরাম রাখবে না। ভেঙে মালপত্র বেচবে। তা বেচলেও কম হবে না। বার্মা সেগুনের কাঠ আর মার্বেলের দামই তো কত উঠবে।

মা একটু হতাশ হয়ে বলল, অত কি দেবে? তবু শাওলরাম একটা দর দিয়েছে। আর তো কেউ দরও দিচ্ছে না।

কেউ কিনতে আসছে না, কারণ শাওলরাম সবাইকে টিপে রেখেছে। আপনাকে চৌদ্দ লাখ দেবে, আরও পনেরো বিশ লাখ টাকা অন্যদের খাওয়াবে। ওসব চালাকি তো আমরা জানি। আপনি চেপে বসে থাকুন। শাওলরামই দর বাড়াবে।

কথাটা শুনে মায়ের ভরসা হল না। বলল, অত টাকা কেউ দেবে না মদন।

এক লপ্তে না হল, ভাগে ভাগে বিক্রি করবেন না হয়। তাতে অনেক বেশি টাকা পাবেন।

কে ওসব করবে? আমার কি কেউ আছে?

এই বলে মা একটু কান্নাকাটি করল। যাই হোক, এইসব কথাবাতার পর বাড়ি বিক্রি পিছিয়ে গিয়েছিল। দু মাস বাদে শাওলরাম এসে ফের তাগাদা দিতে লাগল। এ বার আরও দু লাখ বেশি দর দিতে রাজি হল, যেন খুব ঠকা হয়ে যাচ্ছে এমন মুখের ভাব করে। আরও দুমাস বাদে হীরেনবাবু আর অতুলবাবুর মধ্যস্থতায় শাওলরাম বিশ লাখ টাকা পর্যন্ত উঠল। বলে গেল, এ দর আর বাড়বে না।

এসব এক মাস আগেকার কথা। বন্দনার এত মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, সেই মন খারাপই যেন জ্বর হয়ে দেখা দিল।

এই বাড়িটার পরতে পরতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে যেন রেণু-রেণু হয়ে ছড়িয়ে আছে। এত মায়া যে, এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না। কিন্তু বাবা যখন রমা মাসিকে নিয়ে আসবে তখন তো মা থাকবে না এ বাড়িতে। মাকে ছেড়ে সেও তো থাকতে পারবে না। কী যে হবে! তার চেয়ে এই তিনতলার ছাদ থেকে যদি আজ সে লাফিয়ে পড়ে মরে যায় তাও ভাল। শরীরে নয়, অশরীরী হয়ে এই বাড়িতেই হয়তো ঘুরে ঘুরে বেড়াবে সে।

বাগানে একটা টর্চের ঝিলিক দেখা গেল। দশ বারোটা ছেলেকে জ্যোৎস্নার মধ্যে ছুটতে দেখতে পেল বন্দনা। কে যেন চেঁচিয়ে বলল, দেয়ালের আড়ালে প্রোটেকশন নিয়ে চালাস।

দুটো ছেলেকে দেয়ালের ওপরে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল বন্দনা। হাতে কিছু একটা অস্ত্রশস্ত্র আছে। বাইরের গলিটা এখন নিঃঝুম। ৫৩৮

ফট করে একটা শব্দ হল কোথায় যেন। বন্দনা শিহরিত হয়ে টের পেল ভ্রমরের মতো গুঞ্জন তুলে তার মাথার ওপর দিয়ে কী যেন একটা উড়ে গেল। দেয়াল থেকে দুটো ছেলেই লাফিয়ে নেমে পড়ল এদিকে। কে যেন বলল, গুলি চালাচ্ছে শালা। জোর বেঁচে গেছি।

তবু ভয় করল না বন্দনার। জ্যোৎস্নায় স্নান করতে করতে সে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। রেলিঙের ওপর তার দুখানা আলগোছ হাত। সটান হয়ে স্পষ্ট হয়ে সে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ মায়ের গলা শুনতে পায় বন্দনা, ওরে আমার মেয়েটা...

বন্দনা নড়ল না। আজ রাতে তার খুব মরতে ইচ্ছে করছে।

তাদের বাগানে আরও কয়েকটা ছেলে ঢুকে পড়েছে। ধুতি আর শার্ট পরা বাবুদাকে সে এই ম্লান জ্যোৎস্নার আলোতেও চিনতে পারল। বাবুদা বলল, সবাই এখানে ঢুকলে হবে না। বড় রাস্তা দিয়ে গলির দুটো মুখ দিয়ে ঢুকতে হবে। কালকের মতো।

আদেশ পেয়েই কয়েকজন ফিরে দৌড়ে গেল সদরের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপরই বাইরের গলিতে প্রচণ্ড শব্দে চার-পাঁচটা বোমা ফাটল। সেই সঙ্গে গুলির আওয়াজ। আরও দুটো ভ্রমরের গুঞ্জন খুব কাছ দিয়েই উড়ে গেল বন্দনার।

তবু একটুও ভয় করল না তার। পাথরের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পৃথিবীর কোনও ঘটনাই তাকে আজ আর স্পর্শ করছে না যেন। তার খুব হালকা লাগছে। তার ভেসে পড়তে ইচ্ছে করছে হাওয়ায়।

তাদের সদর দরজার কড়া ধরে কে যেন জোর নাড়া দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে একটা তীব্র চিৎকার কামা! কর্তামা !

মা সভয়ে চিৎকার করে ওঠে, কে? কে রে? কী হয়েছে রে?

অতীশের আর্তস্বর শোনা গেল, তামা, ছাদে বন্দনা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে নামিয়ে আনুন। বাইরে গুলি চলছে।

বন্দনা ছাদে? কে বলল তোকে?

আমি দেখেছি কর্তামা । ও পিছন দিকেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকেই গুলি চলছে। ওকে নামিয়ে আনুন।

বন্দনার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা রাগের স্রোত বয়ে গেল। সে ছুটে উল্টো দিকের রেলিঙে এসে ঝুঁকে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, বেশ করেছি দাঁড়িয়ে আছি। তাতে তোমার কী? তোমার কী?

উঠোনের দিকটায় সরে গেল অতীশ। ল্যাংচাচ্ছে। ওপর দিকে চেয়ে বলল কী করছ তুমি ওখানে?

আমি মরব। তোমার তাতে কী?

অতীশ হতভম্ব হয়ে বলল, মরবে কেন? নেমে এসো। আমার মরতে ইচ্ছে হয়েছে। তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

জ্যোৎস্নায় ঊর্ধ্বমুখ হয়ে অতীশ অসহায় গলায় বলল, ওসব বলতে নেই। বেঁচে থাকতে মানুষ কত কষ্ট করে জানো না? নেমে এসো।

নামব না। যাও, কী করবে? তুমি লোভী। টাকার জন্য সব করতে পারো তুমি। দীপ্তিদির সঙ্গে পর্যন্ত...।

সিঁড়ি দিয়ে মা আর বাহাদুর উঠে আসছিল দ্রুত। আর সময় নেই। ওরা ধরে নিয়ে যাবে। বন্দনা আরও ঝুঁকে পড়ল নীচের দিকে, তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি লোক।

অতীশ খুব ভালমানুষের মতো গলায় বলল, হ্যাঁ, তা তো জানি। অনেকদিন ধরে জানি। আমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

কী করছিস সর্বনাশী। কী করছিস? বলতে বলতে মা এসে ধরল তাকে।

বাহাদুর মুখে আফশোসের শব্দ করে বলল, পড়েই যেতে যে আর একটু হলে।

বন্দনা নেমে এল। একটু ঘোর-ঘোর অবস্থা তার। যেন পুরো চৈতন্য নেই। যেন খানিকটা স্বপ্নাচ্ছন্ন। খানিকটা জাগা।

মা চাপা স্বরে বলল, গা যে বেশ গরম। ছাদে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলি রে অসভ্য মেয়ে

অনেকক্ষণ মা।

কেন?

আমার মন ভাল নেই মা, আমার মন ভাল নেই।

রাতে জ্বর বাড়ল বন্দনার। বুকে একটু ব্যথা, কাশি, সর্দি, হাঁচি, আর বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বোমার শব্দ। গুলির শব্দ। যেমন দেওয়ালির দিন শোনা যায়, অবিকল তেমনি।

বন্দনার জ্বর উঠল একশো চারে। বিকারের ঘোরে সে দেখছে ফুটফুটে শীতের সকালে তাদের শান্ত বাগানে গাছের ছায়ায় বসে সে পুতুল খেলছে। আজ পুতুলের বিয়ে। পুরুতমশাই কখন আসেন তার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

মধ্যরাতে পুলিশের গাড়ি ঢুকল পাড়ায়। প্রথম টিয়ার গ্যাস। তারপর গুলি। বাড়ি ঘর ভরে গেল বারুদের গন্ধে।

ভোররাতে পিছনের বস্তির টিউবওয়েলের ধারে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল ল্যাংড়া। পুলিশের শক্তিশালী রাইফেলের গুলি তার ঘাড় ভেঙে দিয়ে গেছে, বুকে মস্ত ফুটো দিয়ে রক্তের ফোয়ারা বেরিয়ে রাস্তা ভাসিয়ে দিল।

পরদিন নির্বিকার সূর্য ফের উঠল আকাশে। ততক্ষণে কোলাহল থেমে গেছে। মোট চারটে ডেডবডি তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। সকাল আটটার ট্রেন ধরবে বলে রওনা হয়ে গেল দীপ্তি। বাহাদুর তাকে রিক্সা ডেকে তুলে দিয়ে এসে বলল, ল্যাংড়া সাফ হয়ে গেছে মা। বাঁচা গেল।

মদনকাকা তার হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে এসে বন্দনার নাড়ি ধরে অনেকক্ষণ দেখে বলল এ যে খুব জ্বর!

হ্যাঁ। একশো চার। মা বলল।

নাড়ির অবস্থাও ভাল বুঝছি না। জ্বর বিকারে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। নিউমোনিয়া হওয়াও আশ্চর্য নয়। অ্যালোপ্যাথিই ভাল বউঠান। টাইফয়েডের পর শরীর কাঁচা থাকে।

ঘোরের মধ্যেই চোখ মেলে বন্দনা জিজ্ঞেস করল, ও কি চলে গেছে?

মা ঝুঁকে বলল, কে? কার কথা বলছিস? দীপ্তি? সে এই তো গেল। গিয়ে নাকি কলেজ করবে।

ডাক্তার ডেকো না মা, আমি আর ভাল হতে চাই না।

ও কী কথা? চুপ করে শুয়ে থাক।

কে মারা গেছে মা?

ও ল্যাংড়া।

আর?

আর কে জানি না। মোট চারজন।

উঃ।

কী হল?

খবর নাও কে মারা গেল আর।

ওসব ষণ্ডা-গুণ্ডাদের খবরে আমাদের কী দরকার? মরেছে বাঁচা গেছে।

উঃ মা, খবর নাও।

নিচ্ছি মা নিচ্ছি। ও বাহাদুর খবর নে তো কে কে মারা গেছে।

একটু বাদে মা এসে বলল, ল্যাংড়া, কুচো, ভোলা আর বিশু। কারা এরা তাও জানি না বাবা। তবে ভোলার মা বছরটাক আগে আমাদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করত। বেচারা।

বন্দনা অস্ফুট গলায় বলল, কত শুদ্ধ ছিলে তুমি, কত পবিত্র ছিলে! এঁটোকাঁটা হয়ে গেলে? আমার তো মোটে সতেরো বছর বয়স....এখনও কত দিন বাঁচতে হবে বলো তো! একা! কী ভীষণ একা।

মা বলল, মনটা ভাল নেই মা, আমাদের অতীশটাকে নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে!

বন্দনা কথাটা শুনতে পেল না। এক ঘুমঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তখন।

মা বলল, পুলিশ নিয়ে তো বড় মারে। বোকা ছেলেটা। পুলিশের হাত থেকে নাকি বন্দুক কেড়ে নিতে গিয়েছিল।

চার দিন বাদে জ্বর ছাড়ল বন্দনার। একগাদা অ্যান্টিব্যয়োটিক খেয়ে শরীর আরও দুর্বল। আরও দুদিন বাদে হঠাৎ তাদের উঠোনে একটা রিক্সা এসে থামল ঠিক দুপুরবেলায়। একজন রোগা বুড়ো মানুষ একখানা হোট ব্যাগ হাতে খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল। গায়ে একটা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি, পরনে আধময়লা ধুতি, পায়ে হাওয়াই চটি। বারান্দায় তার চেয়ারে বসে ছিল বন্দনা। বুড়ো মানুষটিকে দোতলায় বিনা নোটিশে উঠে আসতে দেখে ভ্রু কুঁচকে চেয়ে ছিল বন্দনা। কোনও আত্মীয় কি? চেনা?

মানুষটি তার দিকে কেমন এক বিমূঢ় চোখে চেয়ে ছিল। পলক পড়ছে না। একটাও কথা নেই। মুখে। পরাজিত বিধ্বস্ত একজন মানুষ।

বন্দনাও চেয়ে ছিল। গুড়গুড় গুড়গুড় করে পায়রা ডাকছে সিলিঙে। কেমন যেন করছে বুকের মধ্যে বন্দনার।

ঠিক এই সময়ে মা বেরিয়ে এসে বারান্দায় পা দিল। তারপর থমকে দাঁড়াল।

বুড়ো মানুষটি কাঁপছিল থরথর করে। হাত থেকে স্বলিত ব্যাগটা পড়ে গেল শানে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এলে তা হলে!

বুড়ো মানুষটি কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। একবার হাঁ করল। তারপর মুখ বুজে ফেলল। চোখের কোলে জল।

রেণু! বলে লোকটা আর পারল না। উবু হয়ে বসে পড়ল হঠাৎ। তারপর দুই হাতে মুখ ঢাকল। কাঁদল বোধহয়।

লোকটা কে তা বুঝতে পারে বন্দনা, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। এই কি তার সেই বাবা, যে কিনা একজন কবির মতো মানুষ। শৌখিন আনমনা, কল্পনায় ডুবে থাকা। যে বাবা তাকে শিখিয়েছিল ঘোট ঘোট নানা জিনিসের মধ্যে রূপের সন্ধান। বাইরের দুনিয়া নরখাদক বাঘের মতো বাবাকে চিবিয়ে খেয়েছে। না, সবটা নয়। অর্ধেক ফেরত দিয়েছে বুঝি। প্রেতলোক থেকে যেন বাবার এই আগমন।

বন্দনা উঠল না, দৌড়ে গেল না, চিৎকার করল না আনন্দে, উদ্বেল হল না, শুধু চেয়ে রইল। দেখল, মা গিয়ে বাবাকে হাত ধরে তুলছে। বলল, এসো, বোসো। এ তোমারই বাড়িঘর। অত লজা পাচ্ছ কেন?

একটা ময়লা রুমাল পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে বাবা নাক আর চোখ মুছল। দ্বিতীয়বার বলল, রেণ।

বলো। কী বলবে?

বন্দনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘরে চলে এল। এ কোন বাবাকে ফেরত দিল পৃথিবী? এ কেমন ফেরত পাওয়া? তার বুকের ভিতরে যে একটা পাথরের মতো স্তব্ধতা। মানুষ এত পাল্টে যায়।

ঘর থেকেই সে শুনতে পেল, মা বলছে, বোসো চেয়ারে। একটু জিরিয়ে নাও। কথা পরে হবে।

বাবা বসল। বলল, একটু জল দেবে?

মা জল নিতে ঘরে এসে বলল, বাবাকে প্রণাম করতে হয়। শত হলেও গুরুজন।

বন্দনা নড়ল না। চুপ করে বসে রইল। পাথর হয়ে।

জল খেয়ে বাবা আরও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ওরকম চিঠি লিখলে কেন রেণু?

কেন, আমি কি খারাপ কিছু লিখেছি?

এ বাড়ি ছেড়ে তুমি কেন যাবে?

নইলে উপায় কী?

আমি বলতে এসেছি, তুমি থাকো। আমি তো কাটিয়েই দিয়েছি আয়ু। বাকিটা কেটে যাবে।

তা কেন? কষ্ট করার তো দরকার নেই। রমাকে নিয়ে আসোনি?

না। সে আসতে বড় ভয় পায়।

ভয় কীসের? সে তো এখন সুয়োরানি। আমি দুয়ো।

বাবা একটা খুব বড়, বুক খালি করা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকল।

মা বলল, খাবে তো?

খাব! বলে বাবা যেন খুব অবাক হয়ে গেল।

মা বলল, ভাত খেয়ে এসেছ কি?

না।

দুপুরে এখানেই তো খাবে। আর কোথায় যাবে?

বাবা আর একটা খুব বড় শ্বাস ফেলে বলল, এ চেয়ারে বন্দনা বসে ছিল না?

হ্যাঁ।

আমাকে চিনতে পারেনি। না? কত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছি দেখ! অথচ এখন আমার চুয়ান্ন বছর বয়স! গত দু বছরে কী হয়ে গেল।

প্রেমের মাশুল দিতে হচ্ছে তো! বুড়ো বয়সের প্রেম তার হ্যাপা কি কম?

আমাকে তোমাদের বড্ড ঘেন্না হয়, না? আমার নিজেরই হয়, তোমাদের হবে না-ই বা কেন?

ঘেন্না পিত্তির কথা এখন থাক। চান করে ভাত খেয়ে একটু জিরোও। তারপর কথা হবে।

বাবা কথাটা কানেই তুলল না। বলল, স্টেশনে নামলাম, রিক্সা করে এত দূর এলাম, এর মধ্যে একটা লোকও আমাকে চিনতে পারেনি, জানো? স্টেশনের রেলবাবু না, রিক্সাওলা না, রাস্তার কেউ না। এমন কী মদনের সঙ্গে দেখা হল নীচে, সেও পারল না। মেয়েটা পর্যন্ত পারেনি। শুধু তুমিই দেখলাম, একবারে চিনলে।

আমার না চিনে উপায় আছে!

বিলু কি বাড়িতে নেই?

স্কুলে গেছে।

তবে বুঝি তার সঙ্গে দেখা হল না।

ওমা! কেন হবে না?

আমি চারটের গাড়িতে ফিরে যাব।

তা হলে এলে কেন?

দীপ্তির মুখে শুনলাম তুমি বাসা ভাড়া করে চলে যাবে বলে তোড়জোড় করছ। তাই ছুটে আসতে হল। তুমি ও কাজ কোরো না। তোমরাই থাকবে এখানে। বড় কষ্টে ছিলাম বলে তোমাকে ওরকম একটা অদ্ভুত চিঠি লিখেছিলাম। চিঠিটা পাঠিয়ে মনে হল, কাজটা ঠিক করিনি। সত্যিই তো, ওরকম কি হয়? তোমার যে তাতে অপমান হয় তা আমার মাথায় খেলেনি।

শুধু এইটুকু বলতে এলে?

হ্যাঁ। আর শেষবারের মতো তোমাদের একটু দেখে গেলাম। আর আসব না।

তোমার শরীরের যা অবস্থা দেখছি, ধকল সইবে তো! তেমন জরুরি কাজ না থাকলে আজ বরং থেকেই যাও। নিজের অধিকারেই থাকতে পারবে। এত বছর ঘর করলে আমার সঙ্গে একটা রাত এ বাড়িতে থাকলে আর কী ক্ষতি হবে?

থাকাটা কি ভাল দেখাবে রেণু?

ভাল দেখাবে কি না তা জানি না। তোমার শরীর ভাল দেখছি না বলে বলছি।

মেয়েটা বোধহয় চিনতে চাইল না, না? যাক রেণু, আমি বরং ফিরে যাই। বিলুটাকে দেখে গেলে হত। ওরা সব ভাল আছে তো!

আছে। যেমন রেখে গেছ তেমনই আছে।

আর একটু জল দাও। খেয়ে উঠে পড়ি। আড়াইটেয় একটা গাড়ি আছে। ধরতে পারলে সন্ধেবেলায় কলকাতায় পৌঁছে যাব।

আবার জল নিতে মা ঘরে এল। বন্দনা তখনও খাটে বসে। একদম পাথরের মতো।

একবার দেখা করবি না? একটু চোখের দেখা দেখতে এসেছে। যা না কাছে। শরীরের যা অবস্থা দেখছি, লক্ষণ ভাল নয়।

বন্দনা তবু নড়ল না।

বাবা জল খেল। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। বোধহয় ক্লান্তি। বোধহয় প্রত্যাশা।

মা বলল, এ বাড়ির নাকি এখন অনেক দাম। মদন সেদিন হিসেব করে বলল, এক কোটি টাকার ওপর। শাওলরাম মাড়োয়ারি কুড়ি লাখ টাকা দিতে চাইছে। আর একটু বেশি দাম উঠলে বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ারই ইচ্ছে আমার। তুমি কী বলে?

তোমাকে তো ওকালতনামা দিয়েই রেখেছি। তোমার ইচ্ছে হলে বেচে দিয়ো। বাড়ি দিয়ে কী হবে?

চাও তো তোমাকে কিছু দেব। কষ্টে আছ।

এই প্রথম বাবা একটু হাসল। বলল, না, আর দরকার নেই।

দরকার নেই কেন? খুব নাকি অভাব!

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, সে একটা দিনই গেছে। খুব কষ্টের দিন। কিন্তু সয়েও যায় রেণু। এখন দেখছি, আমার আর অভাবটা তেমন বোধ হয় না। খিদে সহ্য হয়, রোগভোগ সহ্য হয়, অপমানও বেশ হজম করতে পারি। টাকা পয়সার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে। না রেণু, বাড়ি বেচে টাকা-পয়সা হাতে রেখো। তোমার লাগবে।

মত দিচ্ছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। মত দিয়েই রেখেছি। আসি গিয়ে?

দুটো সন্দেশ মুখে দিয়ে যাও।

বাবা উঠতে গিয়েও বসে পড়ল, দাও তা হলে।

সন্দেশ নিতে মা ঘরে এসে বন্দনার দিকে চেয়ে বলল, অন্তত সন্দেশটা নিজের হাতে দাও না বাবাকে। খুশি হবে।

ও লোকটা আমার বাবা নয় মা।

ও কী কথা? ছিঃ। ওরকম বলতে নেই।

আমার বাবা তো এরকম ছিল না মা।

মা ফ্রিজ থেকে সন্দেশ বের করে প্লেটে সাজাতে সাজাতে বলল, চিরদিন কি কারও সমান যায়? শুনেছিস তো অভাবে কষ্টে আছে। চেহারা ভেঙে গেছে, অকালবার্ধক্য এসেছে। তা বলে কি বাবা বলে স্বীকার করবি না?

বন্দনা গোঁ ধরে চুপ করে রইল।

বাবা সন্দেশ খেল। ফের জল খেল। বলল, কম খেলেই আজকাল ভাল থাকি। বুঝলে? এই যে দুটো সন্দেশ পেটে গেল এই-ই এক বেলার পক্ষে যথেষ্ট। উঠলাম, কী বলে?

কী আর বলব। বিলর তো ফিরতে দেরি আছে।

থাক থাক। না দেখাও ভাল। দেখলে মায়া বাড়ে কিনা।

মেয়ে সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে।

থাক থাক। ওকে ওর মতো থাকতে দাও। বড় হচ্ছে, একটা মতামত আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে বাবার খুব সময় লাগছিল। বন্দনা উঠে বারান্দায় এল। তারপর রেলিঙের ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইল। একটু বাদেই বাবাকে দেখতে পেল সে, জীর্ণ শীর্ণ একজন মানুষ রোগা দুর্বল পায়ে ধীরে ধীরে উঠোনটা পেরোচ্ছে। পেরোতে পেরোতে

একবার মুখ ফিরিয়ে ওপরের দিকে তাকাল। এই তাকানোটা ওই মুখ ফেরানোটাই যেন তীব্র মোচড়ে বুক ভেঙে দিল বন্দনার। বাবা শেষবারের মতো চলে যাচ্ছে। আর আসবে না। উঠোনটা পেরোলেই তাদের সঙ্গে সব বন্ধন ছিঁড়ে যাবে। কেন মুখ ফেরাল বাবা? কেন?

বন্দনা হঠাৎ নিজের অজান্তেই অনুচ্চ স্বরে ডাকল, বাবা! একটু দাঁড়াও।

বাবা ভাল শুনতে পায়নি। যেতে যেতেই আর একবার মুখটা ফেরাল, তাকাল। তারপর ভুল শুনেছে মনে করে চলে যাচ্ছিল।

বন্দনা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নীচে। তারপর ছুট-পায়ে গিয়ে দেউড়ির কাছে মানুষটার পথ আটকে দাঁড়াল। কোথায় যাচ্ছ তুমি এই রোদে? না খেয়ে? বলতে বলতে বহু কালের সমস্ত কান্না, জমে থাকা যত দুখ উথাল-পাথাল হয়ে উঠে এল তার বুক থেকে।

৬. এক অফুরান মাঠ

পরান বলল, পারবেন?

পারব। পারতেই হবে।

সামনে এক অফুরান মাঠ। এবড়ো খেবড়ো চষা জমি। স্টেশন যে কত দূর! একমাস হয়ে গেছে, তবু অতীশের সর্বাঙ্গ আজও ব্যথিয়ে আছে। পুলিশ তার প্রত্যেকটা জয়েন্ট ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কনুই, হাঁটু, মেরুদণ্ডের তলার দিকটা। মারতে মারতে যেন নেশা ধরে গিয়েছিল ওদের। তবু চেঁচায়নি অতীশ। একটুও যন্ত্রণার শব্দ বেরোয়নি মুখ দিয়ে। কেবল দৃশ্যটা মনে পড়ছিল। হাবু মণ্ডলের ঘরের পাশে সে আর বিশু দাঁড়িয়ে। রাত তখন সোয়া একটা হবে। বোমবাজির শেষ খেলটা খেলছিল বাবু আর ল্যাংড়ার দল। বড় বাড়ির দুধারের গলি দিয়ে বাবুর দল ঢুকে আসছিল। ল্যাংড়া লিড দিচ্ছিল বস্তির দু কোনা আটকে। কার জিত, কার হার তখনও বোঝ যাচ্ছিল না। আচমকা একটা চিৎকার শোনা গিয়েছিল, রিট্রিট!

ওই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে গলির দুধার থেকে বাবুর দলের ছেলেরা পিছিয়ে যেতে লাগল। তারপর হাওয়া হয়ে গেল।

বিশু চাপা গলায় বলল, এর মানে কী জানো তো গুরু? পুলিশ নামছে।

প্রথমে কয়েকটা টিয়ার গ্যাসের শেল এসে পড়ল গলির মধ্যে। তার পিছনে বুটের আওয়াজ। ল্যাংড়ার দলের ঝানু ছেলেরা চটপট বেরিয়ে এসে টিয়ার গ্যাসের শেলগুলো পটাপট বড় বাড়ির দেয়ালের ওধারে ফেলে দিল। তারপর গা-ঢাকা দিল। তারপর আড়াল থেকে মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে এসেই বোমা মেরে পালিয়ে যাচ্ছিল অলিগলির মধ্যে। পুলিশের সঙ্গে এরকম লুকোচুরি খেলার অভ্যাস এদের আছে।

পুলিশ ঢুকছিল দুধার দিয়েই। কিছু এল বড় বাড়ির ভিতর দিয়ে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে গলে। এখনও ফায়ারিং অর্ডার দেওয়া হয়নি। তবু বিশু বলল, চলো গুরু, সরে পড়া যাক।

হাবু মণ্ডলের পাশের গলিতে ঢুকে তারা নিশ্চিন্তেই এগোচ্ছিল। কোনও বিপদ ছিল না।

আচমকাই একজন সাব ইন্সপেক্টর আর কনস্টেবল ঢুকে এল গলিতে। কিছু বোঝাই গেল না। দুম করে একটা শব্দ হতেই বিশু যেন ছিটকে শুন্যে উঠে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ এক অসহনীয় ছটফটানি। তারপর নিথরও। অতীশ আমূল বিস্ময়ে তার জীবনের দ্বিতীয় মৃত্যু-দৃশ্যটা দেখল। কিন্তু এবার আর সেই স্তম্ভন ছিল না, সেই ভয়টাও নয়। একটা পাগলা রাগে ক্ষিপ্তের মতো সে গলির মুখে ছুটে গেল। সাব ইন্সপেক্টরের হাতে খোলা রিভলভার, কনস্টেবলের হাতে রাইফেল। তাকে ছুঁড়ে দিতে পারত।

কেন মারলেন কেন মারলেন? কী করেছে ও? কেন গুলি করলেন? বলতে বলতে সে কনস্টেবলটার ওপরে গিয়ে পড়েছিল। একটা লাথি মেরে কনস্টেবলটাকে ফেলে দিয়ে রাইফেলটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিল সে।

সাব ইন্সপেক্টর কমল রায় গৌরাঙ্গর দাদা। চেনা লোক। শুধু তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, কী করছ? যাও বাড়ি যাও। গো হোম!

কিন্তু ততক্ষণে বাহিনীটা এসে গেছে। কমল রায় চিৎকার করে তাদের আটকানোর একটা চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু তখন আশেপাশে বৃষ্টির মতো বোমা ফেলছে ল্যাংড়ার দল। কমল রায় অন্য দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। আর তখন পুলিশের বুট আর রাইফেলের কুঁদোয় পাট পাট হয়ে গেল অতীশ। তাকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় অর্ধচেতন অবস্থায়। লক আপে তার প্রবল জ্বর এসেছিল।

তিন দিন পর হীরেনবাবু তাকে বললেন, ওরে বাবা, পুলিশ কি লোকের নাম-ঠিকানা জেনে তবে গুলি চালাবে? পুলিশকে গুলি চালাতে হয় অন্ধের মতো। টু হুম ইট মে কনসার্ন। বুঝেছ? তোমার বন্ধু মারা গেছে, কিন্তু ইচ্ছে করে তো আর মারেনি বাবা। তুমি একজন স্পোর্টসম্যান, জেলার সাম্পিয়ন। তোমার এগেনস্টে কেস দিচ্ছি না। বাড়ি যাও।

রিক্ত অবসন্ন অতীশ টলতে টলতে বাড়ি ফিরে এল। শরীরের ব্যথা নয়, তার মন-জুড়ে এক বিষের জ্বালা। বিশু নিরীহ ছিল, বিশু ছিল পাড়ার গেজেট, তেমন কোনও দোষও ছিল না ওর। গত একমাস ধরে ক্ষণে ক্ষণে শুধু বিশুর কথা মনে পড়ে।

পরান গাছতলায় বসে বিড়ি টেনে নিচ্ছিল। বলল, কেন যে এত কষ্ট করছেন! দুদিন পর তো কলকাতাতেই চলে যাবেন। সেখানে চাকরি বাকরি করবেন, ভাল থাকবেন, ভদ্রলোক বনে যাবেন। তবে আর এ কষ্টটা করা কেন?

অতীশ দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমি সব কিছু পারতে চাই। বুঝলে!

আপনি শক্ত লোক। পুলিশের ওরকম মার খেলে অন্যে তিন মাস হাসপাতালে পড়ে থাকত। চলুন, গাড়ির সময় হয়ে আসছে। রাস্তা এখনও অনেক।

চল্লিশ কেজি নতুন আলুর বস্তাটা গাছের গোড়ায় দাঁড় করানো। অতীশ উঠল। তারপর বস্তাটা জাপটে কাঁধে তুলে ফেলল। তার পর দুহাতে একটা সাপটা টানে মাথায়।

সাবাস! বলে বাহবা দিল পরান।

পরানের কাছেই শেখা। অতীশ বলল, চলল।

ব্যথা বেদনার শরীর, মাথার ওপর গন্ধমাদনের ভার, সামনে অফুরান পথ। এই মেহনতের ভিতর দিয়েই একটা মোন হয় অতীশের। ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করে শরীর, রগে রগে ছড়িয়ে পড়ে অবসন্নতা, অ ওই নিষ্পেষণের ভিতর দিয়েই নিজের ভিতরে আর একটা নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে সে।

আগে পরান, পিছনে সে। একটু দুলকি চালে দ্রুত পায়ে হাঁটছে তারা। অনেকটা হোটার মতো। ধীরে ধীরে যত কোমল ও সুম বোধ সুপ্ত হয়ে যায়। একটা চেতনা আর জেদ কাজ করে শুধু।

শীতকাল, তবু স্টেশন অবধি আসতেই ঘামে জামা আর প্লান্ট ভিজে সপসপে হয়ে গেল।

পরান বস্তাটা নামিয়ে তার ওপর বসে বিড়ি ধরাতে যাচ্ছিল। অতীশ বলল, পরিশ্রমের পর ওসব খেতে নেই। বুকের বারোটা বাজবে।

আমাদের ওসব সয়ে গেছে।

নিজের বস্তার ওপর উদাসভাবে বসে থাকে অতীশ। আজকাল তার কিছু ভাল লাগে না। কিছু একটা হয়ে উঠতেও ইচ্ছে করে না। থানা থেকে যেদিন ছেড়ে দিল সেদিন অতীশ তার ভাঙা শরীর নিয়েও গিয়েছিল বিশুদের বাড়িতে। বিশুর মা দৌড়ে এসে তাকে দুহাতে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করে বলছিল, ও অতীশ, তুই তো সঙ্গে ছিলি! তুই তো মরলি না, আমার ছেলেটা মরল কেন রে?

বার বার ওই কথা, তুই তো মরলি না, তবে আমার ছেলেটা কেন মরল? কথাটা কানে বড় বাজে আজও। কান থেকে কথাটা কিছুতেই তাড়াতে পারে না অতীশ।

মার-খাওয়া, থ্যাঁতলানো একটা শরীর, সর্বাঙ্গে বীভৎস কালশিটে, কাটা ছেঁড়া নিয়ে চার দিনের দিন ডাক্তার অমল দত্তের কাছে গিয়েছিল সে। অমলদা তাকে দেখে অবিশ্বসে মাথা নেড়ে বলেছিল, এই শরীর নিয়ে তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস কী করে? তুই তো হসপিট্যাল কেস!

জ্বালা-ধরা দুই চোখে হঠাৎ জল,এল তার। বলল, তবু তো বেঁচে আছি।

তুই বেঁচেও আছিস কি? এভাবে ওপেন উভ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে সেপটিক হয়ে মরবি যে! এক্স-রেটা করাস, গোড়ালিটা যা ফুলেছে, মনে হচ্ছে ফ্র্যাকচার।

ক্ষতগুলো ব্যান্ডেজ মেরে, টেটভ্যাক দিয়ে অমলদা একটা প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, সব ব্যাপারে হিরো হতে চাস না, বুঝলি? ওষুধগুলো ঠিকমতো খাস। আর সোজা বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক।

একটু হাসল অতীশ। তার আবার বাড়ি, আবার বিছনা। ঘরে তার জায়গাই হয় না। ইফুলবাড়ির বারান্দায় সে শোয়। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে সেসব কথা জানানোর মানেই হয় না।

শরীর ছাড়া অস্তিত্ব নেই। আবার সেই শরীর যখন অকেজো, অশক্ত হয়ে পড়ে তখন হয়ে ওঠে মস্ত ভারী একটা বোঝার মতো। আহত, থ্যাঁতলানো শরীরটা টেনে টেনে তবু দুদিন উদভ্রান্তের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াল অতীশ। শরীরের ভার আর এক অক্ষম রাগ তাকে এমন তিরিকি করে তুলেছিল যে, বাড়ির লোক অবধি তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায়নি।

পাঁচ পাঁচটা নির্লজ্জ শহিদ বেদি তৈরি হল পাড়ায়। পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে শহরে বন্ধ হল একদিন। তাতে যে মানুষের কী উপকার হল তা কে জানে! সু মানুষ এরকমই সব অর্থহীন কাজ করে।

একটা ডাউন গাড়ি গেল। পান বিড়িটা ফেলে দিয়ে বলল, আজ আপ গাড়িটা লেট করছে।

অতীশ শুধু বলল, হু।

কী ভাবছেন এত বসে বসে?

কত কথা ভাবি।

ডাউন গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল। আপ গাড়ির জন্য দু-চারজন লোক বসে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য অস্তে যাচ্ছে চষা মাঠের ওদিকটায়। বড় খুনখারাপি রং হয়েছে। আকাশে। ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়া লেগে হঠাৎ ঘামে ভেজা শরীরে একটু শীত করে উঠল অতীশের।

মাথার ওপরে জ্যোৎস্না আর চারদিকে বারুদের গন্ধ, বোমা ফাটছে গুলি চলছে, আর ছাদ থেকে ঝুঁকে বন্দনা বলছে, আমি মরলে তোমার কী? তুমি বিচ্ছিরি লোক। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি লোক! দৃশ্যটা এত ঘটনাবলির ভিতর থেকে যেন আলাদা হয়ে বড় মনকে উদাস করে দেয়। একদিন তেমাথার কমল স্টোর্সের কাছে সকালের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল অতীশ, একটা রিক্সায় বন্দনা কলেজে যাচ্ছিল। গায়ে একটা কমলা রঙের শাল জড়ানো, মুখখানা পাণ্ডুর, চোখ দুখানা বিষণ্ণতায় ভরা। যেন মানুষ নয়। যেন খুব ফিনফিনে খুব নরম জিনিস দিয়ে তৈরি একটা পুতুল। কী সুন্দর। তাকে দেখতে পায়নি, ভারী আনমনা ছিল। রিক্সাটি যখন দূরে চলে যাচ্ছে তখন অতীশ বিড়বিড় করে বলেছিল, তাই কি হয় খুকি? তাই কি হয়? তুমি হলে আমাদের মনিব, অন্নদাতা।

একটা বিষণ্ণ ঘণ্টির শব্দ চারদিকটাকে মথিত করতে থাকে হঠাৎ। পরাণ বলল, গাড়ি আসছে।

দিন পাঁচ-ছয় আগে একদিন রাতে বাড়ি ফিরতেই মা বলল, কাবাবু ফিরেছে, জানিস?

অতীশ অবাক হয়ে বলে, সে কী?

কী রোগা হয়ে গেছেন, চেনা যায় না। সঙ্গে ছোট বউ আর ছেলেও এসেছে। এখন এখানেই থাকবে।

একসঙ্গে?

তাই তো শুনছি। বড় গিন্নির সঙ্গে নাকি রফা হয়েছে। খবর পেয়ে তোর বাবা গিয়েছিল দেখা করতে। কতবাবুর বলে কী হাউহাউ কান্না। অনেক দিন বাদে নিজের বাড়িতে ফিরে নিজেকে সামলাতে পারছেন না। ছোট বউটা নাকি বড় গিমির ভয়ে একতলার সিঁড়িতে ছেলে কোলে করে বসে ছিল। বড় গিন্নির আপন পিসতুতো বোন হলে কী হয়, ছেড়ে কথা কওয়ার মানুষ বড় গিন্নি নয়। কদিন পরেই লাগবে।

বড়দি সেলাই করতে করতে বসল, তার ওপর আবার বুড়ো বয়সে ছেলে হয়েছে, ই। কত লোক আসছে রঙ্গ দেখতে। কী লজা, কী ঘেন্না বাব্বা।

ফাঁকা ট্রেনে বসে পরান আবার বিড়ি ধরিয়ে বলল, আজ যে খুব ভাবিত দেখছি আপনাকে। বলি হলটা কী?

অতীশ একটু হাসল। কিছু বলল না। আজকাল সে ভাবে। আজকাল সে খুব ভাবে।

স্টেশনে আলুর বস্তাটা নামিয়ে রিক্সায় তুলল অতীশ। পরান বলল, আলুর ব্যবসাই যদি করবেন তো বড় করে করুন। আমাদের মতো ছোট ব্যাপারি হয়ে থাকলে আর কপয়সা হবে। তারকেশ্বর, বাঁকড়ো, বর্ধমানের দিকে চলে যান, ট্রাক ভর্তি মাল নিয়ে আসুন, পকেটে টাকা ঝনঝন করবে।

অতীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বন্দনা সেদিন তাকে লোভী বলেছিল। বলেছিল, টাকার জন্য তুমি সব পারো। অতীশ কি তাই পারে? অতীশ কি ততটাই লোভী?

বাজারে পাইকারের কাছে আলুর বস্তা গস্ত করে টাকাগুলো প্যান্টের পকেটে ভরল অতীশ। পকেটে হাত রেখে টাকাগুলো কিছুক্ষণ খামচে ধরে রইল। লোভী? সে কি লোভী? তুমি তো জানো না খুকি, এক একটা কথা কত গভীরে বিধে থাকে।

খুব কি পাপ হবে? পাপ পুণ্য বলে কিছু আছে কি না সেই সিদ্ধান্তে আসতে পারে না অতীশ। তবু তিনটে ডাইনির মতো তার পথ আটকে দাঁড়াতে চায় তিনটে জিনিস। বয়সে

বড়, বিধবা আর ছেলের মা। এই তিন ডাইনি তার পথ আটকায় বটে, কিন্তু তবু তার ইচ্ছে করে ওসব গায়ে না মাখতে। দীপ্তি একজন ঝলমলে মেয়ে, জিয়ন্ত, কত হাসিখুশি। মস্ত একটা চিঠি দিয়েছে সে। পাছে অতীশের বাড়ির কেউ খুলে পড়ে সেইজন্য ইংরিজিতে লেখা। ম্যানেজমেন্ট কোর্সে অতীশকে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে আছে। কম্পিউটার ট্রেনিং-ও। পুরনো সংস্কার গায়ে না মাখলেই হয়। কিছু স্মৃতির ধুলো শুধু গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে অতীশকে। পারবে না?

আজকাল অতীশ খুব ভাবে। ভাবতে ভাবতে পকেটের টাকাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে পথ হাঁটে।

৭. দুপুরবেলা চুপি চুপি

দুপুরবেলা চুপি চুপি নীচে নেমে এল বন্দনা। একতলার পশ্চিমের ঘরটাই সবচেয়ে অন্ধকার আর ড্যাম্প। এই ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে রমা মাসি। কিছুতেই ওপরের ঘরে যেতে রাজি হয়নি। প্রথমদিন এসে শুধু মাকে একটা প্রণাম করে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। মা ধমক দিয়েছিল, চুপ কর!

ধমক খেয়ে চুপও করেছিল রমা মাসি। তারপর সেই যে এই ঘরে ছেলে নিয়ে ঢুকল, আর বেরোয় না। কাউকে মুখ দেখায় না।

দরজায় টোকা দিল বন্দনা।

রমা মাসির ভীত গলা বলে উঠল, কে?

আমি মাসি। দরজা খোলো।

দরজা খুলে বিহ্বল মাসি হাসবে না কাঁদবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। দুটো বিপরীত ভাব মানুষের মুখে আর কখনও এরকম খেলা করতে দেখেনি বন্দনা। সে মাসিকে দুহাতে ধরে বলল, কেঁদো না, তোমার ছেলেটাকে চলো তো দেখি। আমি ভীষণ বাচ্চা ভালবাসি।

আয়।

রোগা বাচ্চাটা শুয়ে ঘুমোচ্ছ মশারির মধ্যে।

খুব শীত পড়েছে মাসি, ওকে রোদে নিয়ে তেল মাখাও না?

ঘরেই মাখাই।

কেন মাসি? ঘরের বাইরে যেতে ভয় পাও কেন?

রমা মৃদু গলায় বলল, কত ক্ষতি করে দিলাম তোদের। আমার জন্যই তো এত সব হয়ে গেল! মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

ওসব ভুলে যাও।

রমা হঠাৎ তার দুটো হাত ধরে বলল, তোর জন্যই আমরা এখানে ফের আসতে পারলাম। রেণুদিকে তুই-ই রাজি করিয়েছিস। তুই এত ভাল কী বলব তোকে? যদি এখানে না আসতাম তা হলে আমরা আর বেঁচেই থাকতে পারতাম না। তোর জন্যই

ওসব বলতে নেই মাসি। আমার মা একটু রাগী ঠিকই, কিন্তু মা ভীষণ ভালও তো!

খুব ভাল রে! কিন্তু রেণুদির কী সর্বনাশটাই না আমি করলাম!

শোনো মাসি, একটু ওপরে টোপরে যেও, ঘোরাফেরা কোরো, নইলে সম্পর্কটা সহজ হবে না।

সাহস পাই না যে রে!

মা তোমাদের ওপর রেগে নেই কিন্তু।

কী করে বুঝলি?

মাকে আমি খুব বুঝি। বাইরের রাগ একটু আছে হয়তো, কিন্তু ভিতরে রাগ নেই।

আমার বড্ড ভয় করে রেণুদিকে।

রাত্রিবেলা মায়ের পাশে শুয়ে বন্দনা হঠাৎ বলল, মা, তুমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করো?

হঠাৎ ওকথা কেন?

এমনি। বলো না করে কি না?

করব না কেন? চিরকাল শুনে আসছি মানুষ মরে আবার জন্মায়।

বন্দনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি রমা মাসির ছেলেটাকে দেখেছ মা?

মা একটা বিরক্তির শব্দ করে বলল, প্রবৃত্তি হয়নি।

বন্দনা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক দাদার মতো দেখতে।

মা হঠাৎ নিথর হয়ে গেল। তারপর বলল, কে বলেছে?

কে বলবে মা! আমারই মনে হয়েছে।

তুই ওই বয়সের প্রদীপকে তো দেখিসনি!

না তো। কিন্তু একটা আদল আসে।

বাজে কথা। ঘুমো।

বন্দনা ঘুমোল। কিন্তু পরদিন ভারী অন্যমনস্ক রইল মা। তার পরদিন গিয়ে হানা দিল রমার ঘরে।

দু দিন বাদে ছেলেটা মায়ের কোলে কোলে ঘুরতে লাগল।

এই ছলনাটুকু করতে খারাপ লাগল না বন্দনার। এই ফাঁকা ভূতুড়ে বাড়িটায় একটু জনসমাগম হয়েছে। একটু প্রাণের স্পর্শ লেগেছে। এক নষ্ট হোক, সে চায়নি।

বাবা বড় বুড়িয়ে গেছে। মুখে কেবল মরার কথা। আমি আর বেশি দিন নয় রে। আমার হয়ে এসেছে।

বাঁচতও না বাবা। সেদিন দুপুরে এসে চলে যাওয়ার সময় বন্দনা গিয়ে যদি না আটকাত তা হলে বাবা বোধহয় পথেই পড়ে মারা যেত সেদিন। বন্দনা জোর করে ধরে নিয়ে এল। স্নান করতে পাঠাল, ভাত খাওয়াল। যেতে দিল না সেদিন। আর রাতে মায়ের কাছে কেঁদে পড়ল সে, ও মা, বাবাকে এখানে আসতে দাও।

মা বলল, আসুক না। আসতে তো বলছি। আমি থাকব না।

কেন মা? আমরাও কেন থাকি না এখানে?

তা কি হয়? আমার আত্মসম্মান নেই?

রমা মাসি তো খারাপ মানুষ নয় মা, সে তো কখনও তোমার অবাধ্যতা করেনি। এক ধারে এক কোণে পড়ে থাকবে। এত বড় বাড়ি, তুমি টেরও পাবে না।

শুনে মা খুব রাগ করল। বলল, এত কাণ্ডের পরও একথা বলতে পারলি তুই? ওদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকব! কেন, আমার কি ভিক্ষেও জুটবে না?

বন্দনা মায়ের পা ধরেছিল, ওরকম বোলো না মা। বাবার কী অবস্থা দেখছ না। এ অবস্থায় ফেলে তুমি কোথায় যাবে?

আমাকে ফেলে যায়নি তোর বাবা?

তার শাস্তি তো পেয়েছে মা।

সারা রাত মায়ের সঙ্গে তার টানাপোড়েন চলল। ভোর রাতের দিকে মা ধীরে ধীরে নরম হয়ে এল। কাঁদল। তারপর বলল, তোদের মুখ চেয়ে না হয় সেই ব্যবস্থা মেনে নিলাম। কিন্তু লোকে তো হবে।

এখন লোকে হাসে না মা। লোকের তত সময় নেই।

কিন্তু রমা নীচের তলা থেকে ওপরে উঠতে পারবে না কখনও। মনে রাখিস।

কথাটা মা নিজেই মনে রাখেনি। দশ দিনের মাথায় রমা মাসিকে দিব্যি দোতলায় ডেকে আনল মা। বলল, আমি ছেলেটাকে দেখছি, তুই রান্নার দিকটা সামলে নে।

চমকে উঠে রমা মাসি যেন কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ে বলল, যাচ্ছি রেণুদি।

শাওলরাম মাড়োয়ারি এই সেদিনও এসে বাবার কাছে খানিকক্ষণ বসে থেকে গেছে। তার একটাই কথা, চৌধুরী সাহেব, বিশ লাখ দর তুলে বসে আছি। কিছু একটা বলুন।

বাবা হয়তো রাজি হয়ে যেত। বিষয়বুদ্ধি বলতে বাবার তো কিছু নেই। বন্দনা বাবাকে বলে রেখেছে, এ বাড়ি ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না বাবা। এ বাড়ি তুমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারবে না।

বাবা তার দিকে চেয়ে হেসে বলেছে, আমারও তাই ইচ্ছে। শেষ কটা দিন এ বাড়িতেই কাটাই।

তুমি একটা কাজ করবে বাবা? বস্তির দিককার খানিকটা জমি বিক্রি করে দাও। বাকিটা আমাদের থাক।

পরদিনই মদনকাকা আর বাহাদুর মিলে ফিতে টেনে পিছনের দিককার জমিটা মাপজোক করল। মদনকাকা বাবাকে এসে বলল, বিঘে দুই হেসে খেলে বের করা যাবে। দু বিঘের অনেক দাম। পিছনের জমি বলে দাম কিছু কম হবে। তাও ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ ধরে রাখুন। শাওলরাম দিনে দুপুরে ডাকাতির চেষ্টা করছে।

তাদের বাড়ির ভোল পাল্টাচ্ছে আস্তে আস্তে। মরা বাড়িটা জেগে উঠছে। একটু প্রাণের স্পর্শ লাগছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু বন্দনার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইশলের মতো দীর্ঘ টানা বাঁশির মতো কী যেন বেজে যায়। একমাস পার হয়ে গেছে। অতীশ কলকাতায় চলে গেল বোধহয়! কবে গেল? বলেও গেল না?

মা! ও মা! ছেলে ফিরে পেয়ে সব ভুলে গেলে যে। বাবা ফিরে এল, এবার নারায়ণপুজো দেবে না?

তাই তো। কত দিন পুজোপাঠ নেই। বাহাদুরকে দিয়ে ভট্টচামশাইকে খবর পাঠা তো।

বাহাদুরকে ভটচামশাইয়ের কাছে পাঠাল বন্দনা। কিন্তু মনে মনে বলল, হে ঠাকুর, ভটচামশাইয়ের যেন কাল জ্বর হয়। যেন অতীশ আসে। তার যেন কলকাতায় যাওয়া না হয়ে থাকে ....

এক মাসের জায়গায় দেড় মাস পেরিয়ে গেছে, অতীশের থাকার কথা নয়। এই ভেবে বন্দনার বুকটা ধুক ধুক করতে লাগল অনিশ্চয়তায়।

পরদিন সন্ধেবেলা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল বন্দনা। কে আসবে? কে আসবে? কে আসবে? হে ঠাকুর ...

গায়ে নামাবলি জড়ানো পুরুত ঠাকুর যখন তার লাজুক মুখটা নামিয়ে নম্র পায়ে উঠে আসছিল সিঁড়ি বেয়ে তখন যে কেন আনন্দে হার্টফেল হল না বন্দনার কে বলবে? তার খুব হাততালি দিয়ে হো হো করে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল। ইচ্ছে হল ছাদে গিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়তে। ইচ্ছে হল আজ ঘুমের মধ্যে মরে যেতে।

যতক্ষণ পুজো করল অতীশ, বন্দনার দুটো চোখের পলক পড়ল না। ঠাকুর আজ তার দুটো চোখ ভরে দিচ্ছেন। আর কিছু চায় না বন্দনা। আর কিছু নয়। শুধু মাঝে মাঝে যেন দু চোখ ভরে দেখতে পায়।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল পিছনের বাগান। কুয়াশায় মাখামাখি। নতমুখে বাগানটা পেরোচ্ছিল অতীশ। আতা গাছটার তলায় কে যেন বসে আছে! অতীশ থমকে দাঁড়াল।

কলকাতায় কবে যাচ্ছ?

অতীশ একটু হাসল, এখানে বসে থাকতে হয় বুঝি খুকি? ঠাণ্ডা লাগবে না?

কথার জবাব দাওনি।

যাচ্ছি না। তিনটে ডাইনি যেতে দিচ্ছে না।

ডাইনি! সে আবার কী?

আছে। তুমি বুঝবে না। ঘরে যাও ঠাণ্ডা লাগবে।

আমি মরব।

ওরকম বলতে নেই।

আমি মরলে তোমার কী?

সে কি বোঝাতে পারি?

তুমি একটা বিচ্ছিরি লোক।

জানি খুকি, জানি।

শোনো, আমাদের পিছনের দু বিঘে জমি বিক্রি হবে। বাবার তো একটুও বুদ্ধি নেই। কে আমাদের এত সব কাজ করে দেবে বলো? তুমি ভার নেবে? বাবা বলেছে টেন পারসেন্ট কমিশন।

অতীশ একটু হাসল। বলল, আমি বড় লোভী, না খুকি?

বন্দনা ভ্রু কুঁচকে বলল, লোভীই তো!

তারা আর কোনও কথা বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি। তারা বলল না, কিন্তু তাদের হয়ে আজ রাতের জ্যোৎস্না, একটু কুয়াশা আর পুরনো এই বাড়ির প্রাচীন এক হাওয়া কত কথা কয়ে গেল। কত কথা উঠে এল মাটির গভীর থেকে, আকাশ থেকে ঝরে পড়ল। তাদের চারদিকে সেইসব কথা উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। গুনগুন, গুনগুন।